

অনীশ দেব

বাড়িটায় কেউ যেয়ো না

বাড়িটায় কেউ যেয়ো না



অনীশ দেব

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড

Baritay Keu Jeyo na
(A collection of detective stories)
Code : 54 B 26

Dev sahitya Kutir (Pvt.) Ltd.
21, Jhamapukur Lane, Kolkata-700 009
www.devsahityakutir.com
E. Mail : dev_sahitya@rediffmail.com
Tel : 2350-4294/4295/7887

ISBN. 978-93-5060-109-9

প্রথম প্রকাশ : মে ২০১৭, ১লা বৈশাখ ১৪২৪
দ্বিতীয় সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ২০১৮, ফাল্গুন ১৪২৪
তৃতীয় সংস্করণ : অগস্ট ২০১৯, শ্রাবণ ১৪২৬

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ২১, ঝামাপুকুর
লেন, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে শ্রী রাজর্ষি মজুমদার
কর্তৃক প্রকাশিত এবং বি. সি. মজুমদার কর্তৃক
বি. পি এম'স প্রিন্টিং প্রেস, রঘুনাথপুর,
দেশবন্ধুনগর, উত্তর ২৪ পরগনা
থেকে মুদ্রিত।

প্রচ্ছদ : রঞ্জন দত্ত

উৎসর্গ

স্নেহের
সমুদ্র বসু
প্রীতিভাজনেষু

সূচিপত্র

গল্প

উপন্যাস

একজনের ভেতরে দুজন

অজয়কে নিয়ে কখনও গল্প লিখব ভাবিনি। কিন্তু গতকাল সন্ধেবেলার একটা ঘটনায় অজয় মনের সামনে চলে এল। সময়ের গাড়ি এক ঝটকায় আমাকে উড়িয়ে নিয়ে গেল পঞ্চাশ বছর পেছনে। আমি পৌঁছে গেলাম আমার স্কুলে। ক্লাস সেভেনের 'সি' সেকশানের ক্লাসরুমে। কতই বা বয়েস তখন আমার? সত্যি-সত্যি 'বাও কি তেও—মা বলেছে আও কম'।

অজয় আমার সহপাঠী ছিল, কিন্তু বন্ধু ছিল না। সত্যি বলতে কী, গোটা ক্লাসে অজয়ের কোনও বন্ধু ছিল না। ও ছিল একা, কিন্তু দ্রষ্টব্য। ও নানান ঢঙে বিচিত্র সব দুষ্টুমি পারফর্ম করত। আর আমরা, ক্লাস সেভেনের বাকি আটত্রিশ কি উনচল্লিশ জন, অজয়ের পারফরম্যান্স অবাক হয়ে দেখতাম। অজয় ছিল বলতে গেলে 'হিরো'। আমরা ছিলাম নীরব দর্শক।

অজয়ের কথা লিখতে গিয়ে ওর মুখটা ভেসে উঠছে চোখের সামনে।

গোলগাল চেহারা, মাথায় কোঁকড়ানো চুল, চোখে কালো ফ্রেমের চশমা। চশমার কাচের আড়ালে দুটো প্রাণবন্ত চঞ্চল চোখ। ঠোঁটের ওপরে হালকা গোঁফের রেখা।

শুধু অজয় কেন, একইসঙ্গে ভেসে উঠছে ক্লাসরুমটাও। আমরা সবাই যে-যার ডেস্কের সামনে ছোট-ছোট চেয়ারে বসে আছি।

আমাদের স্কুলটা ছিল মাঝ-কলকাতার এক বিখ্যাত সরকারি স্কুল। ট্রামরাস্তার পাশেই তার বিশাল বিল্ডিং। বিল্ডিং-এর লাগোয়া এক প্রকাণ্ড পার্ক। পার্কে প্রচুর গাছপালা, এবং তার ঠিক মধ্যিখানে এক মনোরম চৌকো দিঘি। সেই বিশাল চৌকো দিঘিকে ঘিরে ছিল বেশ কয়েকটা সাঁতারের ক্লাব।

আমাদের ক্লাসরুমটা ছিল পার্কের দিকে, দোতলায়। লাস্ট পিরিয়ডে ক্লাসরুমের জানলা দিয়েই আমরা দেখতে পেতাম বাচ্চাকাচ্চারা হাত-পা ছুড়ে সাঁতার শিখছে।

অজয় আমার প্রথম নজর কাড়ে ওর গানের জন্যে।

একজন টিচার ক্লাস শেষ করে চলে যাওয়ার পর পরের টিচার ক্লাসে ঢুকতে-ঢুকতে দশ কি পনেরো সেকেন্ড সময় পেরিয়ে যেত। সেই অবসরটুকুতে আমরা বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে গল্পে মেতে উঠতাম। সকলের কথাবার্তা মিলেমিশে গিয়ে এক প্রবল গুঞ্জন তৈরি হয়ে যেত ক্লাসরুমে।

কিন্তু অজয় সেসবের মধ্যে ছিল না। দুটো ক্লাসের মাঝখানের এই ফাঁকটুকুতে ও ডেস্কে তাল ঠুকে গান ধরত।

না, অজয়ের গানের গলা ছিল না। বেসুরো হেঁড়ে গলায় ও গান গাইত। দেশাত্মবোধক গান। যেমন, 'ছেড়ে দাও রেশমি চুড়ি বঙ্গনারী কভু হাতে আর পোরো না', 'জননী গো লহ তুলে বক্ষে সান্ত্বন বাস দেহ তুলে চক্ষে', 'ধনধান্য পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা'।

কিন্তু স্যার ক্লাসে ঢুকলেই ও চুপ করে যেত।

ক্লাসে আমি যেখানে বসতাম, আর অজয় যেখানে বসত, এই দুটো জায়গার মধ্যে দূরত্ব ছিল অনেকটাই। তাই আমি দূর থেকে আমার সহপাঠীকে লক্ষ করতাম। ও সবসময় শক্তি আর ফুর্তিতে টগবগ করত। বেশ বুঝতে পারতাম, ঠিকঠাকভাবে লেখাপড়া করার জন্যে ওর জন্ম হয়নি।

আমাদের সময়ে স্কুলের জানলাগুলো ছিল পুরোনো ধাঁচের। কাঠের ফ্রেমে কাচের শার্সি বসানো। জানলাটার মোট তিনটে ভাগ। জানলার মাঝের অংশটা ছিল ফিক্সড—দেওয়ালের মতো। আর তার দু'পাশের দুটো অংশে ছিল দুটো এক পাল্লাওয়ালা জানলা। তবে জানলার কোথাও কোনও গরাদ কিংবা গ্রিলের ব্যাপার

ছিল না। অনেকটা ফ্রেঞ্চ উইন্ডোর মতো। আর জানলার বাইরে বেশ চওড়া কার্নিশ। ফলে ইচ্ছে করলে কেউ বাইরে থেকে বেয়ে উঠে জানলা দিয়ে ঘরে ঢুকে পড়তে পারে।

জানলা নিয়ে এত কথা বলার কারণ, অজয়ের কীর্তিকাহিনির প্রথম এপিসোডে জানলার একটা বিশেষ ভূমিকা আছে।

সকালবেলার প্রথম ক্লাস। বাংলার স্যার পীতাম্বরবাবু ক্লাসে ঢুকে গুছিয়ে বসেছেন। পোশাক ধপধপে ধুতি আর পাঞ্জাবি। রোগা, ফরসা চেহারা। চোখে চশমা।

কয়েকমাস এই স্যারের ক্লাস করার অভিজ্ঞতায় আমরা সকলেই জেনে গেছি এই স্যার বেশ কড়া এবং গম্ভীর প্রকৃতির। তাই আমরা ওঁকে নিজেদের মধ্যে 'ভোম্বল' নামে ডাকি।

শুধু তাই নয়, একদিন অঙ্কের স্যার মহাদেববাবুর পিরিয়ডে প্রক্সি দিতে পীতাম্বরবাবু এসেছিলেন। এসেই মাপা গলায় বলেছিলেন, 'অ্যাই, শোনো। তোমাদের মধ্যে একজন এখানে এসো। এসে একটা গল্প বলো। বাকি সবাই মন দিয়ে শুনবে—কেউ কোনও গোলমাল করবে না—।'

স্যারের কথা শেষ হওয়ামাত্রই অজয় হাত তুলে বলেছিল, 'আমি গল্প বলব, স্যার?'

'হ্যাঁ, চলে এসো—।'

অজয় গম্ভীর মুখে স্যারের খাটো মঞ্চের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। গম্ভীর গলায় স্যারকে জিগ্যেস করল, 'স্যার, ''ভোম্বল সর্দার'' গল্পটা বলব?''

স্যার 'হ্যাঁ' বলার আগেই আমরা গোটা ক্লাস হেসে কুটিপাটি। কিন্তু অজয় তখনও গম্ভীর মুখে স্যারের দিকে তাকিয়ে স্যারের অনুমতির অপেক্ষা করছে।

তো যেদিনের কথা বলছিলাম।

সকালবেলার প্রথম ক্লাসে এসে পীতাম্বরবাবু রোলকল করতে শুরু করেছেন। আমরা রোল নম্বর অনুযায়ী পরপর সাড়া দিচ্ছি : 'প্রেজেন্ট, স্যার', 'ইয়েস স্যার', 'প্রেজেন্ট প্লিজ' ইত্যাদি।

অজয়ের রোল নম্বর ছিল আঠেরো। স্যার 'এইটিন' বলে ডাকার সঙ্গে-সঙ্গে কোথা থেকে যেন উত্তর ভেসে এল, 'প্রেজেন্ট প্লিজ।'

অজয় যে-ডেস্কে বসত সেইদিকে তাকালেন পীতাম্বরবাবু।

অজয়ের ডেস্ক-চেয়ার খালি।

অবাক হয়ে স্যার আবার ডাকলেন, 'রোল নাম্বার এইটিন—।'

আবার উত্তর এল, 'প্রেজেন্ট প্লিজ—।'

কিন্তু অজয়কে দেখা যাচ্ছে না।

আমরাও বেশ অবাক হয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে অজয়কে খুঁজে বেড়াচ্ছি, কিন্তু অজয় ক্লাসে কোথাও নেই।

'অজয়, তুই কোথায়? শিগগিরই বেরিয়ে আয়—।' বেশ উত্তেজিত হয়ে ডেকে উঠলেন পীতাম্বরবাবু।

উত্তরে এক অদ্ভুত শব্দ ভেসে এল। দু-ঠোঁট মুখের ভেতরে ঢুকিয়ে বাতাস টানলে যে বিচিত্র শব্দ তৈরি হয়, সেরকম শব্দ করে কেউ একটা তাল বাজানোর চেষ্টা করছে। স্যারের হুঙ্কারে সে-শব্দ মোটেই থামেনি।

ততক্ষণে আমাদের অনুসন্ধানী চোখ সেই মিউজিশিয়ানকে খুঁজে পেয়েছে। সে আর কেউ নয়—আমাদের অজয়।

একটা জানলার বাইরে কার্নিশে অজয় চিত হয়ে শুয়ে রয়েছে। দু-হাঁটু ভাঁজ করা। মুখে ওই পিকিউলিয়ার শব্দ করছে, আর হাত দিয়ে নিজের দু-হাঁটুতে তাল ঠুকছে।

আমরা সবাই মজা পেয়ে হেসে উঠেছিলাম, কিন্তু স্যার ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। কারণ, ওই কার্নিশ থেকে অজয় যদি অসাবধানে পড়ে যায়!

এক অদ্ভুত স্নেহমাখা গলায় পীতাম্বরবাবু ডেকে উঠেছিলেন, ‘বাবা অজয়, আয় বাবা, ক্লাসের ভেতরে চলে আয়। অ্যাই, তোরা কয়েকজন ওকে হেলপ কর। সাবধানে ধরে ওকে ক্লাসের ভেতরে নামা...।’

আমরা কয়েকজন অজয়কে হেলপ করার জন্যে উঠে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই অজয় জানলা দিয়ে ঢুকে এল, এক লাফে নেমে পড়ল ক্লাসরুমে।

আমরা সবাই চুপ। মনে একটা কী হয়, কী হয় ভাব। লক্ষ করলাম, পীতাম্বরবাবু এবার পালটে গেছেন। একটু আগের আশঙ্কা, স্নেহ এখন উধাও। তার বদলে তিনি ঠান্ডা চোখে অজয়ের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। এমন ঠান্ডা সেই দৃষ্টি যে, ওঁর চোখের পাতাও পড়ছে না।

স্যার যেন হিসহিস করে অজয়কে কাছে ডাকলেন, ‘আয়, এদিকে আয়...।’ তারপর ফার্স্ট বেঞ্চে স্যারের কাছাকাছি বসা অশোক নামের এক সহপাঠীকে বললেন, ‘অশোক, তোর স্কেলটা দে তো।’

অশোক বরাবরই স্যারদের প্রতি অনুগত প্রাণ। ও সঙ্গে-সঙ্গে নিজের স্কেল বাড়িয়ে দিল স্যারের দিকে! সে-আমলের কাঠের স্কেল—এক ফুট লম্বা।

পীতাম্বরবাবু অস্বাভাবিকরকম রেগে গেলে তবেই শারীরিক আক্রমণের পথে যেতেন। এবং সেইসব আক্রমণে ওঁর বরাবরের হাতিয়ার ছিল স্কেল।

অজয় পায়ে-পায়ে স্যারের কাছে এগিয়ে গেল। ক্লাসরুম থমথম করছে। কারও মুখে কোনও কথা নেই।

‘জানলার বাইরে ওই কার্নিশে গিয়ে উঠেছিলিস কেন?’ স্যার কথা বলার সঙ্গে-সঙ্গে বাতাসে স্কেল নাড়ছিলেন।

‘কার্নিশে গিয়ে তো উঠিনি, স্যার। জানলার বাইরে ওই যে শিমুল গাছটা রয়েছে, ওটা বেয়ে পার্কে নেমে গিয়েছিলাম...।’

এই পর্যন্ত শোনামাত্রই বাতাসে স্কেল নাড়ার ব্যাপারটা থেমে গেল। দেখলাম, স্যার গোল-গোল চোখ করে অজয়ের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। অজয় তখনও ওর অ্যাডভেঞ্চারের কৈফিয়ত দিয়ে চলেছে।

‘পার্কে স্যার, একটা কাঠগোলাপ গাছ আছে। তাতে অনেক ফুল। আর কী সুন্দর গন্ধ!’ এ-কথা বলার সঙ্গে-সঙ্গে পকেট থেকে রুমালের একটা পোঁটলা বের করে ফেলেছে অজয়। রুমালের ঢাকনা সরাতেই প্রকাশিত হল একরাশ কাঠগোলাপ ফুল। তাদের অসংখ্য সাদা পাপড়ি। আর অদ্ভুত সুন্দর গন্ধ।

স্যারের দিকে ফুলের আঁজলা বাড়িয়ে অজয় বলল, ‘আপনি এগুলো নিন, স্যার—খুব সুন্দর ফুল...।’

পীতাম্বরবাবু পলকে আবার পালটে গেলেন। অশোকের স্কেল টেবিলে রেখে অজয়ের হাত থেকে ফুলগুলো নিলেন। সেগুলো টেবিলে রেখে অজয়ের চুল ঘেঁটে দিয়ে বললেন, ‘এত সুন্দর প্রাইজ কেউ কখনও আমায় দেয়নি রে! কিন্তু তাই বলে এত বড় রিসক কেউ নেয়। যদি পড়ে-টড়ে যেতি! যা, ডেস্কে গিয়ে বোস...।’

সেদিন থেকেই অজয়কে আমি মনে-মনে ‘হিরো’ বলে মেনে নিয়েছিলাম।

অজয় ফুটবল খেলতে ভালোবাসত—আর সেটা খেলতও বেশ। ওর গাঁট্টাগোঁট্টা শরীরে বয়েসের তুলনায় শক্তি অনেকটাই বেশি ছিল। ফুল ব্যাক পজিশানে খেলে সেই শক্তি ও দিব্যি কাজে লাগাত।

আমাদের স্কুলের ভেতরে সিমেন্ট বাঁধানো উঠোন ছিল। উঠোনটার চেহারা ছিল ইংরেজি ‘L’ অক্ষরের মতো। আমাদের টিফিনের জন্যে বরাদ্দ সময় ছিল মাত্র কুড়ি মিনিট। টিফিন খাওয়ার পর যেটুকু সময় হাতে থাকত সেই সময়টা আমরা অনেকেই একটা ইটের টুকরোকে ‘ফুটবল’ বানিয়ে সেই বাঁধানো উঠোনে দিব্যি ফুটবল খেলতাম। আমাদের পায়ে থাকত কালো রঙের চামড়ার বুটজুতো—যেটা স্কুল ড্রেসেরই অঙ্গ। ফলে ওই বিচিত্র ‘ফুটবল’ খেলার সময় পায়ে চোট পাওয়ার তেমন ভয় ছিল না।

ওই ‘ফুটবল’ খেলার সময়েই আমি অজয়ের বাড়তি শক্তির ব্যাপারটা বেশ টের পেয়েছিলাম।

অজয়কে নিয়ে দ্বিতীয় যে-ঘটনাটার কথা মনে পড়ছে সেটা হয়েছিল ইতিহাসের স্যার রমাপদবাবুর ক্লাসে।

রমাপদবাবু ভীষণ রোগা ছিলেন। হাত-পাগুলো ছিল দড়ি পাকানো। নাকটা ঈগল পাখির মতো। গাল ভাঙা। সবসময়েই বিরক্তিতে যেন কপাল কুঁচকে আছেন।

ওঁর চোখে চশমা ছিল। ধুতির খুঁট দিয়ে সেই চশমার কাচ পরিষ্কার করাটা ওঁর একরকম মুদ্রাদোষ ছিল বলা যায়।

আমরা স্যারের ডাকনাম দিয়েছিলাম 'কঞ্চি'। সেই নামটা আমরা শুধু নিজেদের মধ্যেই ব্যবহার করতাম।

আর স্যার আমাদের সব্বাইকে একটাই নামে ডাকতেন: 'বাঁদর।' শুধু মাঝে-মাঝে ওঁর পছন্দসই কোনও বিশেষণ ওই 'বাঁদর' শব্দটার আগে বসিয়ে দিতেন। যেমন, আমাদের চেহারার সাইজ দেখে রমাপদবাবু কাউকে বলতেন 'বড় বাঁদর', কাউকে বলতেন 'মিডিয়াম বাঁদর'। আবার কাউকে বলতেন 'ছোট বাঁদর'। তবে অজয়ের জন্যে স্যারের স্পেশাল ডাক ছিল 'লঙ্কা বাঁদর'। এই নামের যে কী তাৎপর্য তা আমরা কখনও বুঝতে পারিনি।

রমাপদবাবু সবসময় বলতেন, 'শোন, প্রত্যেকটা মোমেন্টে আমাদের বয়েস বাড়ে। বয়েস বাড়ে, আর ইতিহাস তৈরি হয়—বুঝলি? এই যে চল্লিশ মিনিট ধরে তোরা আমার ক্লাস করলি, তোদের সবার বয়েস ফর্টি মিনিটস করে বেড়ে গেল, আর হিস্ট্রি তৈরি হয়ে গেল। ইতিহাস এত চুপিচুপি তৈরি হয় যে, খেয়াল না করলে টের পাওয়া যায় না।'

এই ধরনের কথাবার্তা রমাপদবাবুর ফেভারিট ছিল। সুযোগ পেলেই সেগুলো একদফা করে আউড়ে নিতেন। সবসময়েই বোঝাতে চাইতেন যে, বিষয় হিসেবে ইতিহাস কী সাংঘাতিক গুরুত্বপূর্ণ।

একদিন রমাপদবাবুর ক্লাস চলছিল। ক্লাসের মাঝামাঝি সময়ে ফোর্থ বেঞ্চ থেকে অজয় হাত তুলল: 'স্যার, একটু বাইরে যাব?'

'কেন রে, লঙ্কা বাঁদর? কী এমন জরুরি কাজ পড়ল যে বাইরে যাবি?'

উত্তরে অজয় ওর বাঁ-হাতের কড়ে আঙুলটা উঁচিয়ে দেখাল: 'ছোট বাইরে যাব, স্যার—।' নরম সুরে অজয়ের আবেদন শোনা গেল।

'যা, যা—চটপট সেরে আয়।'

স্যারের অনুমতি পাওয়ামাত্রই অজয় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে এবং ক্লাসরুমের দরজার দিকে চটপটে পায়ে রওনা দিয়েছে।

ব্যাপারটা সাদামাঠা 'ছোট বাইরে'-র কেস বলেই আমরা সবাই ধরে নিয়েছিলাম। কিন্তু বহু মিনিট পেরিয়ে যাওয়ার পরেও অজয় ফিরছে না দেখে আমরা কেউ-কেউ প্রমাদ গুনলাম।

সাধারণত 'ছোট বাইরে'-র অপারেশানে বড়জোর তিন কি চার মিনিট লাগে। কিন্তু অজয় তো দেখছি প্রায় বিশ মিনিট পার করে দিয়েছে!

রমাপদবাবু পড়ানোর ফাঁকে-ফাঁকে বারবার দরজার দিকে তাকাচ্ছিলেন। দেখছিলেন, অজয় ফিরল কি না।

হঠাৎ সবাইকে চমকে দিয়ে ক্লাসের দরজায় অজয় এসে হাজির।

'স্যার, আসব?'

স্যার অজয়ের দিকে তাকালেন। আমরাও।

আমরা সবাই একসঙ্গে অবাক হয়ে গেলাম। কারণ, অজয়ের মাথা ভরতি পাকাচুল!

'ক-কী-কী রে? তোর মাথার এ কী অবস্থা হয়েছে?'

অজয় বলল, 'স্যার, আমার বয়েস বেড়ে গেছে।'

আমরা সবাই হো-হো করে হেসে উঠলাম।

স্যার আমাদের দিকে ফিরে 'চোপ!' বলে ধমক দিয়ে অজয়কে আবার জিগ্যেস করলেন, 'বাথরুমে গিয়ে এতক্ষণ ধরে কী করছিলি, হতভাগা?'

'চুপিচুপি ইতিহাস তৈরি করছিলাম, স্যার।' অজয়ের নিষ্পাপ উত্তর।

এরপর যে-হাসির রোল উঠেছিল, স্যারের মালটিপল ধমকও তাকে থামাতে পারল না।

উত্তেজিত রমাপদবাবু চেয়ার ছেড়ে তিরবেগে ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন অজয়ের ওপরে। ওর চুলের মুঠি ধরে গালে একটা থাপ্পড় কষালেন।

হয়তো স্যার আরও কিছু করতেন, কিন্তু তার আগেই পিরিয়ড শেষের ঘণ্টা পড়ে গেল। এবং অজয়ও বেঁচে গেল।

স্যার চলে যেতেই অজয়কে আমরা অনেকে চেপে ধরেছিলাম: 'বল, কী করে তোর চুল পাকালি?'

অজয় হেসে বলল, 'আটা দিয়ে। বাড়ি থেকে খানিকটা আটা ঠোঙায় করে নিয়ে এসেছিলাম। বাথরুমে গিয়ে সেই আটা মাথায় বুলিয়ে নিয়েছিলাম। দেশের বাড়িতে দেখেছি, যাত্রাপালায় মাথায় আটা বুলিয়ে মেকাপ নিচ্ছে, চুল পাকাচ্ছে—।'

আমরা সবাই আলোচনা করতে লাগলাম, অজয় রমাপদবাবুকে রীতিমতো 'ঐতিহাসিক' ধাক্কা দিয়েছে।

বন্ধুদের কার কাছে যেন শুনেছিলাম, অজয়দের একটা ছোট্ট মনিহারি দোকান আছে—কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের (এখন যার নাম বিধান সরণি) ট্রামরাস্তার ওপরে। নাম 'দাদুভাই স্টোর্স'। অজয়ের বাবা দোকান চালান। আর অজয় নাকি স্কুল ছুটির পর সন্ধেবেলা দু-ঘণ্টা করে দোকানে বসে, বাবাকে একটু বিশ্রাম দেয়।

আমি হাতিবাগান থেকে রোজ স্কুলে যাতায়াত করতাম—ওই কর্নওয়ালিস স্ট্রিট ধরে। যাতায়াতের পথে ট্রাম কিংবা বাস থেকে গলা বাড়িয়ে অজয়দের দোকানটাকে খুঁজতাম।

দেখতে-দেখতে একদিন খুঁজেও পেলাম। ছোট্ট মলিন দোকান। রংচটা সাইনবোর্ড। দোকানে ধুতি আর ফতুয়া পরে একজন রোগামতন বয়স্ক মানুষ বসে আছেন। গাল বসা, মাথায় টাক। খোঁচা-খোঁচা কাঁচাপাকা দাড়ি-গোঁফ। অজয়ের বাবা।

দোকানটাকে খুঁজে পাওয়ার পর থেকেই স্কুলে যাতায়াতের পথে আমার চোখ আমার অজান্তে 'দাদুভাই স্টোর্স'-কে খুঁজে বেড়াত। এবং পেয়েও যেত।

ক্লাস এইটে ওঠার পরেও অজয়ের সঙ্গে একই সেকশানে পড়ার 'সৌভাগ্য' আমার হয়েছিল। সেই ক্লাসে অজয় এমন এক কীর্তি ঘটিয়ে বসেছিল যেটা আমি আজও ভুলতে পারিনি।

ব্যাপারটা হয়েছিল হরিনাথবাবুর ক্লাসে।

এখানে হরিনাথবাবু সম্পর্কে দু-চারটে কথা বলা দরকার।

তিনি আমাদের অ্যাডিশন্যাল ইংলিশ পড়াতেন। অর্থাৎ, প্রথাগত ইংরেজি ক্লাসে যে-টেক্সট বই বা গ্রামার পড়ানো হত, ওঁর পড়ানোর এলাকা ছিল তার বাইরে। ফলে হরিনাথবাবুর ক্লাসে আমরা নতুন-নতুন ইংরেজি শব্দ আর সেসব শব্দ দিয়ে মজার-মজার বাক্যরচনা, কিংবা শব্দের জাগলারি শিখতাম।

যেমন, তিনি ক্লাসে প্রশ্ন ছুড়ে দিতেন, 'বল—, How can you make a mile smile?'

আমরা উত্তর না দিয়ে স্যারের মুখের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ বসে থাকতাম।

পাঁচ কি দশ সেকেন্ড অপেক্ষা করার পর স্যার হেসে বলতেন, 'এই সহজ প্রশ্নটার উত্তর কেউ দিতে পারলি না? The letter "s" makes a mile smile, বুঝলি?'

হরিনাথবাবু মাঝবয়েসি মানুষ। চোখে গোল-গোল কাচের চশমা। মাথায় কদমছাঁট চুল। উচ্চতায় খুব খাটো ছিলেন। সবসময় ধুতি আর পাঞ্জাবি পরতেন। আর হাঁটতেন আরশোলার মতো তাড়াতাড়ি। স্কুলের লম্বা বারান্দা ধরে ওঁর হেঁটে যাওয়া দেখলে আমরা হাসি চেপে রাখতে পারতাম না। শুধুমাত্র হাঁটার ঢঙের জন্যেই আমরা স্যারের গোপন ডাকনাম রেখেছিলাম 'ককরোচ'।

হরিনাথবাবুর মধ্যে একটা কমিক-কমিক ব্যাপার ছিল। তা ছাড়া ওঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে আমাদের নিজেদের মধ্যে নানান তর্ক-বিতর্ক চলত। এর কারণ ছিল আমাদের বাৎসরিক স্কুল ম্যাগাজিন।

আমাদের স্কুল ম্যাগাজিনে হেডস্যার থেকে শুরু করে সব টিচারের নাম ছাপা হত। আর সেই নামের পাশে-পাশে ছাপা হত স্যারদের সব অ্যাকাডেমিক ডিগ্রি। সেই ম্যাগাজিনেই আমরা দেখেছিলাম, আমাদের

অঙ্ক স্যারের এম. এ. ডিগ্রি—যা বহুকাল হল দেখা যায় না। আমাদের বাংলা স্যার পীতাম্বরবাবুর নামের পাশে ডবল এম. এ. ডিগ্রি ছিল—একটা বাংলায়, আর অন্যটা সংস্কৃতে। সেই ডবল এম. এ. ডিগ্রিও অনেক বছর হল উধাও।

তো নানান স্যারের নানান ডিগ্রির মধ্যে হরিনাথবাবুর নামটা আমাদের চোখে কটকট করত, কারণ স্যারের নামের পাশে কোনও ডিগ্রিই লেখা থাকত না। ব্যাপারটা আমাদের ভারী অদ্ভুত লাগত। তাই স্যার আসলে যে ঠিক কী পাশ, কতটুকু পাশ, এসব নিয়ে আমরা আলোচনা করতাম। এসব আলোচনা যে অশোভন এবং অন্যায় সেটা ওই ছোট বয়েসে আমরা বুঝতে পারিনি। তবে স্কুল কর্তৃপক্ষও স্কুল ম্যাগাজিনে স্যারদের নামের পাশে-পাশে তাঁদের অ্যাকাডেমিক ডিগ্রি ছাপার প্রথাটা না রাখলেই পারতেন। ছাত্রদের কাছে স্যারদের শুধু নামই কি যথেষ্ট নয়!

সে যা-ই হোক, হরিনাথবাবু একদিন অজয়ের দুষ্টুমির শিকার হলেন।

স্যার ক্লাসে হাসি-হাসি মুখ করে আমাদের ইংরেজি শেখাচ্ছিলেন—অ্যাডিশনাল ইংলিশ। যেটাকে আমরা কখনও-কখনও বলতাম 'বাড়তি' ইংরেজি।

যেমন, স্যার প্রশ্ন করতেন, How a lot goes through a slot?

আমরা উত্তর দিতে পারি বা না পারি, স্যার একটু পরেই হেসে বলতেন, 'The letter ''s'' makes a lot go through a slot,'—বুঝলি?'

এরকমই আর-একটা প্রশ্ন ছিল, 'What makes a road broad?'

এভাবেই আমরা হরিনাথবাবুর কাছে 'বাড়তি' ইংরেজি শিখতাম।

একদিন ক্লাস চলার সময় অজয় হাত তুলে স্যারের কাছে বাথরুমে যাওয়ার পারমিশান চাইল।

কোনও স্যারের ক্লাসের মাঝে অজয় বাথরুমে যাওয়ার পারমিশান চাইলেই আমরা নতুন কোনও দুষ্টুমি দেখার প্রত্যাশায় থাকতাম।

হরিনাথবাবু অজয়কে জিগ্যেস করলেন, 'বিগ অর স্মল?'

অজয় বলল, 'লিকুইড, স্যার—।'

অজয়ের মুখে 'লিকুইড' শুনে আমরা সবাই তো হেসে খুন। কিন্তু হরিনাথবাবু কী এক আশ্চর্য ক্ষমতায় নিজের গাম্ভীর্য ধরে রাখলেন। তিনি তাড়াতাড়ি অজয়কে অনুমতি দিয়ে ব্যাপারটার নিষ্পত্তি করলেন।

'যা, তবে তাড়াতাড়ি ফিরে আসবি—।'

অজয় মুখে কোনও কথা না বলে প্রায় চল্লিশ ডিগ্রি ঘাড় হেলিয়ে দিল এবং চটপট পা চালিয়ে ক্লাস থেকে বেরিয়ে গেল।

কিন্তু ও ফিরে এল এক মিনিটের মধ্যেই।

'মে আই কাম ইন, স্যার?'

গলাটা অজয়ের, কিন্তু মানুষটা কে?

মোটা লোমশ ভুরু। চোখে এক অদ্ভুত চশমা। চশমার দুটো সার্কেলের মাঝে বিশাল মাপের খাড়া গোলাপি নাক। সেই নাকের নীচে পাকানো মোচ।

কে এই লোকটা?

আসলে ব্যাপারটা হল, সেই সময়ে প্লাস্টিকের এই খেলনাটা কিনতে পাওয়া যেত। ভুরু, চশমা, নাক এবং ওই পেল্লায় মোচ একইসঙ্গে আটকানো—অনেকটা একটা মুখোশের মতো। তবে সেই চশমায় কাচ অথবা প্লাস্টিকের কোনও লেন্স থাকত না।

বাথরুমে যাওয়ার নাম করে অজয় বাইরে গিয়ে নিজের চশমাটা পকেটে পুরে তার বদলে ভুরু-চশমা-নাক-মোচের এই অদ্ভুত মুখোশটি পরে নিয়েছে। তারপর কেউকেটা এক অচেনা আগন্তুক সেজে হরিনাথ স্যারের ক্লাসে ফিরে এসেছে।

হরিনাথবাবু একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার করে অজয়কে লক্ষ্য করে লাফ দিলেন। এবং দরজার প্রায় কাছাকাছি গিয়ে ল্যান্ড করলেন। একইসঙ্গে স্যারের মুখ দিয়ে দুটো গালাগাল বেরিয়ে এল। প্রথম গালাগালটা খুবই সাধারণ মানের। একটি মাত্র শব্দে তৈরি। দু-অক্ষরের শব্দ—যার শেষ অক্ষরটি 'লা'।

আর দ্বিতীয় গালাগালটি কিঞ্চিৎ উন্নত মানের। দুটি শব্দে তৈরি—যার সাহায্যে কোনও ব্যক্তিকে একটি বিশেষ পশুর সন্তান হিসেবে সম্বোধন করা হয়।

হরিনাথ স্যারের মুখে আচমকা এইরকম একজোড়া অশিষ্ট সম্বোধন শুনে আমরা যেমন আঁতকে উঠেছি, তেমনই—অন্যায়ভাবে—অদ্ভুত একটু মজাও পেয়েছি।

কিন্তু স্যার ওকে ধরে ফেলার আগেই অজয় দে ছুট। আর কী আশ্চর্য, স্যারও ওকে তাড়া করলেন!

ক্লাসরুমের করিডরের দিকের জানলা দিয়ে আমরা কেউ-কেউ বডি অর্ধেক ঝুঁকিয়ে দিয়ে সেই রেস দেখতে লাগলাম। আর বাকিরা ভিড় জমাল ক্লাসরুমের দরজায়।

সে এক অদ্ভুত দৃশ্য!

স্কুলের লম্বা-চওড়া করিডর ধরে অজয় তিরবেগে দৌড়চ্ছে। আর ওর বেশ খানিকটা পেছনে ছুটে চলেছে 'ককরোচ' স্যার।

একটা ভারী খাতা হাতে উলটোদিক থেকে হেঁটে আসছিল তৃপ্তিদা—আমাদের স্কুলের পিওন। তৃপ্তিদা একটু দুলে-দুলে হাঁটত। তাই আমরা ওর নাম দিয়েছিলাম 'দোলনা'।

স্যার বোধহয় ছুটে-ছুটে হাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তাই তৃপ্তিদাকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়লেন। অজয়ের দিকে আঙুল দেখিয়ে চিৎকার করে বললেন, 'অ্যাই তৃপ্তি,কে এক্ষুনি হেডস্যারের কাছে নিয়ে যা—।'

চার অক্ষরের এই তৃতীয় গালাগালটি দ্বিতীয়টির তুলনায় আরও কিছুটা উন্নত মানের। এবং একইসঙ্গে বেশ ধাক্কা দেওয়ার মতো। আমরা তো সে-ধাক্কা খেয়েই ছিলাম, দেখলাম তৃপ্তিদাও ধাক্কা খেয়ে করিডরে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

না, অজয়কে ধরা যায়নি। ও ততক্ষণে পগার পার। হয়তো ছুটে পালিয়ে গিয়ে বারান্দার পাশের কোনও গাছ বেয়ে নীচের উঠোনে নেমে গেছে।

এই ঘটনার দু-চারদিন পর থেকে হরিনাথ স্যারকে স্কুলে আর দেখিনি। কানাঘুষোয় শুনেছিলাম, স্কুলের মধ্যে অশিষ্ট শব্দ ব্যবহারের জন্যে ওঁকে স্কুল ছাড়তে হয়েছে।

এ-ঘটনায় অজয়েরও মনখারাপ হয়ে গিয়েছিল। কারণ, ও স্যারের সঙ্গে নিছকই একটু মজা করতে চেয়েছিল। তার ফল যে এমনটা হবে সেটা ও ভাবতে পারেনি।

ক্লাস এইটের পর অজয়ের সঙ্গে আর পড়ার সুযোগ পাইনি। কারণ, ক্লাস নাইন থেকে ছাত্রদের চারটি শাখায় ভাগ করা হত—সায়েন্স, টেকনিক্যাল, আর্টস ও কমার্স। আমি সায়েন্স নিয়ে পড়েছিলাম, অজয় নিশ্চয়ই অন্য কোনও শাখায় পড়াশোনা করেছিল। ফলে আমার সঙ্গে ওর দেখা হয়নি।

কথাটা ভুল বলা হল। আমার বলা উচিত, আমি ওকে দেখতে পাইনি। কারণ, অজয় আমাদের কাউকেই সেভাবে চিনত না, কিন্তু আমরা সব্বাই ওকে চিনতাম। আর আমি বোধহয় মনে-মনে একটু-একটু অজয় হতে চাইতাম।

স্কুলের পালা শেষ হল আমার। হয়তো অজয়েরও। তারপর সময়ের স্রোতে পেরিয়ে গেল প্রায় পঞ্চাশ বছর। আমি অজয়কে ভুলিনি। ভুলিনি 'দাদুভাই স্টোর্স' দোকানটিকেও। কিন্তু কাজের জগৎ আমাকে কলকাতার অন্যান্য অঞ্চলে এমন ব্যস্ত করে তুলল যে, 'দাদুভাই স্টোর্স'-এর রাস্তায় কখনও যাওয়া হয়নি। যদি বা কখনও গিয়ে থাকি, আমার মন তখন এতই ব্যস্ত ছিল যে, দোকানটা খেয়াল করিনি।

কিন্তু গতকাল সন্ধেবেলা একটা ব্যাপার হল। বাড়ির একটা জরুরি কাজে একজন ল'ইয়ারের চেম্বারে গিয়েছিলাম। কথাবার্তা শেষ করে বিধান সরণির ট্রামরাস্তার ধারে বাস ধরব বলে দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎই চোখ গেল উলটোদিকের ফুটপাথের একটা ছোট্ট দোকানের দিকে। জীর্ণ, মলিন চেহারা। তোবড়ানো সাইনবোর্ড।

দোকানের নামের কয়েকটা অক্ষর মুছে গেলেও ‘ভাই’ এবং ‘স্টো’ অংশ দুটো পড়া যাচ্ছে। অজয়দের দোকান!

আমার পা দুটো সঙ্গে-সঙ্গে রাস্তা পার হয়ে গেল। আমার দ্বিধা-সঙ্কোচকে পাত্তা না দিয়ে ওরা সটান গিয়ে হাজির হয়ে গেল অজয়ের দোকানের সামনে।

কিন্তু কোথায় অজয়?

দোকানে বসে আছে আঠেরো-উনিশ বছরের একটি ছেলে। রোগা। মাজা রং। সবে দাড়ি-গোঁফ উঠেছে। চোখ দুটো বড়-বড়—যাকে পরিভাষায় আয়ত বলে। মাথার চুল খাড়া-খাড়া। গায়ে একটা চেক-চেক হাওয়াই শার্ট। পায়ে পাজামা।

দোকানের শো-কেস ময়লা। কাচ দু-তিন জায়গায় ফাটা। সেইসব ফাটল পিভিসি টেপ দিয়ে তাপ্পি মারা।

দোকানের শো-কেসের ভেতরে হরেকরকম বলপয়েন্ট পেন, পেনসিল আর রিফিল। দু-পাশের তাকে লাট করে রাখা খাতা আর দিস্তে কাগজ। দোকানের ডানদিকে সুতোয় বাঁধা অনেকগুলো প্লাস্টিকের বল আর খেলনাপাতি ঝুলছে। বোঝাই যাচ্ছে, খাতা, পেন, পেনসিলের পাশাপাশি বাচ্চাদের টুকিটাকি খেলনাও ‘দাদুভাই স্টোর্স’ বিক্রি করে থাকে।

বাঁ-দিকের তাকগুলোর মাঝে একটা ছোট্ট খাঁজে ঠাকুরের আসন চোখে পড়ল। সেখানে খুব সরু-সরু কালো রঙের ধূপকাঠি জ্বলছে।

দোকানে দাঁড়ানো ছেলেটিকে ভালো করে দেখলাম।

না, আমার স্মৃতিতে অমলিন অজয়ের মুখের আদলের সঙ্গে ছেলেটির মুখের আদল কিছুতেই মিলছে না।

তা হলে কি অজয়দের দোকানটার হাতবদল হয়েছে? পঞ্চাশ বছর সময়ের মধ্যে সেটা হতেই পারে। একবার কেন, দু-চারবারও হাতবদল হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু ছেলেটিকে অজয়ের কথা একটিবার অন্তত জিগ্যেস না করে আমি ফিরে যাব না।

‘ভাই, এটা কি অজয়দের দোকান? অজয়—মানে, আমার সঙ্গে ও স্কুলে পড়ত...।’

ছেলেটি হেসে বলল, ‘আপনি আমার বাবাকে চেনেন? হ্যাঁ, বাবা ওই স্কুলটাতেই পড়ত—।’

‘অনেক বছর পর ওর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি—একবার দেখা করা যাবে?’

ছেলেটি ঘাড় কাত করল: ‘হ্যাঁ—কেন যাবে না? বাবা তো সবসময় বাড়িতেই থাকে...।’

কথা বলতে-বলতে ছেলেটি কাউন্টারের কাঠের ডালা তুলে দোকানের বাইরে বেরিয়ে এল। হাত দুটো ঘষে-ঘষে পাজামায় মুছল। পাশেই একটা ছোট টেলারিং-এর দোকান ছিল। সেই দোকানের ভেতরে গলা বাড়িয়ে ছেলেটি কাকে যেন বলল, ‘পারভেজদা, আমার দোকানটা একটু দেখো তো। আমি এই কাকুকে একটু বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসছি। উনি বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন—।’

টেলারিং-এর দোকানের ভেতর থেকে কারও তীক্ষ্ণ গলা শোনা গেল: ‘ঠিক আছে। তবে জলদি-জলদি ব্যাক কোরো—।’

আমরা রওনা হলাম। ছেলেটি আগে, আমি পেছনে।

বড় রাস্তা ছেড়ে বাঁ-দিকের গলি। সেই গলিতে কিছুটা হেঁটে যাওয়ার পরই আবার বাঁ-দিক। এবারে আরও সরু একটা গলি। সেখানে অনেক পুরোনো-পুরোনো খাটো মাপের সব বাড়ি। তারপর কয়েকটা বাড়ির পরেই একটা মলিন বাড়ির ছোট্ট দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ল ছেলেটা। পেছন ফিরে আমাকে ডাকল, ‘আসুন—।’

শেষ পর্যন্ত একটা ঘরে এসে পৌঁছোলাম।

ছোট মাপের ঘর। বাতাসে পুরোনো গন্ধ। ঘরে একটা খাট, আর দুটো টুল। একপাশে একটা টেবিলে বই, খবরের কাগজ আর কয়েকটা জামাকাপড় ডাঁই করা। দেওয়ালের কোণে একটা সেলাই-মেশিন। দেখেই বোঝা যায়, বহুদিন ওই মেশিনে কেউ হাত দেয়নি।

ঘরের শেষ আইটেম হল, বিছানায় বসে থাকা একজন বয়স্ক মানুষ। খালি গা, পরনে লুঙ্গি, রোগা, গাল বসা, মাথায় টাক। খোঁচা-খোঁচা কাঁচাপাকা দাড়ি- গোঁফ। পাঁচ দশক আগে দূর থেকে যে-মানুষটিকে আমি 'দাদুভাই স্টোর্স'-এর কাউন্টারে দেখেছিলাম।

তখনই আমি অজয়কে চিনতে পারলাম।

ছেলেটি আমাকে দেখিয়ে বলল, 'বাবা, ইনি তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন—তোমার স্কুলের বন্ধু...।'

অজয় আমাকে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। বোধহয় পুরোনো 'আমি'-টাকে খুঁজছিল।

একটা টুল দেখিয়ে ছেলেটি আমাকে বলল, 'আপনি বসুন। বাবার সঙ্গে কথা বলুন। আমি দোকানে যাই—নইলে পারভেজদা আবার খচে যাবে—।'

এই কথা বলে অজয়ের ছেলে চলে গেল।

আমি একটা টুল টেনে নিয়ে অজয়ের কাছে বসলাম।

'অজয়, কেমন আছ? আমি অনীশ—।'

অল্প হেসে অজয় বলল, 'ও—।'

বুঝলাম, আমাকে ওর একটুও মনে নেই। আবার জিগ্যেস করলাম, 'কেমন আছ তুমি?'

'চলে যাচ্ছে, ভাই। গ্যাসট্রিকের পেইন নিয়ে আছি। লাস্ট মাসে হার্নিয়া অপারেশন হয়েছে।'

মনে হচ্ছিল, আমার চেনা অজয় নয়, তার ছায়ার সঙ্গে আমি কথা বলছি।

এরপর আমিই কথা বলতে লাগলাম। অজয় শুধু 'হুঁ', 'হ্যাঁ' শব্দ করে ঠেকা দিতে লাগল।

আমি ওর ছোটবেলার কাহিনি ওকেই শোনাতে লাগলাম। সেসব শুনে ও প্রথম-প্রথম ঠোঁটে হাসছিল, অল্প-অল্প মাথা নাড়ছিল। কিন্তু একটু পরেই কেমন যেন চুপ মেরে গেল।

আমি কথা বলতে-বলতে সেই পুরোনো 'অজয়'কে খুঁজছিলাম। কোথায় হারিয়ে গেল আমার সেদিনের সেই হিরো?

সেই 'হিরো'-কে অজয়ও বোধহয় খুঁজছিল।

হঠাৎই দেখলাম, ও ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। মাথাটা ঝুঁকিয়ে দিল বুকের কাছে। ওর পলকা শরীরটা ফুলে-ফুলে উঠতে লাগল।

আমারও কেমন একটা কষ্ট হচ্ছিল, তাই টুল ছেড়ে উঠে পড়লাম। চুপচাপ বেরিয়ে এলাম ওর ঘর থেকে।

বুঝতে পারছিলাম, আজকের 'অজয়' সেদিনের সেই 'অজয়'কে সবসময় খুঁজে চলেছে। খুব মিস করছে সেই দুষ্টু ছেলেটাকে।

আসলে আমাদের প্রত্যেকের ভেতরে দুজন করে মানুষ থাকে। তারা বিশাল সময়ের দূরত্বে দাঁড়িয়েও হাতধরাধরি করে চলতে চায়। একে অপরকে মিস করে।

কিন্তু 'অজয়'-কে তো আমরা হারাতে চাই না!

আমি চাই, আমরা যারা-যারা 'অজয়' হতে পারিনি তাদের আকাঙ্ক্ষার মধ্যে 'অজয়'-রা চিরকাল বেঁচে থাকুক।

এক যে ছিল চোর

সোমপ্রকাশ চুপচাপ বিছানায় শুয়ে ছিলেন। গায়ে জড়ানো শাল।

ঘর অন্ধকার। মাথার কাছে একটা জানলা খোলা। জানলা দিয়ে গাছের কয়েকটা পাতা, ডালপালা দেখা যাচ্ছিল। তাদের ফাঁকফোকর দিয়ে চোখে পড়ছিল একটুকরো রাতের আকাশ। আর সেই আকাশে দু-একটা ফুটফুটে তারা।

শীতের সময়েও সোমপ্রকাশের অন্তত একটা জানলা খোলা রাখা চাই। নইলে ওঁর মনে হয় দম যেন বন্ধ হয়ে আসছে।

কিন্তু এখন, একটা জানলা হাট করে খুলে রাখা সত্ত্বেও, সোমপ্রকাশের দম বন্ধ হয়ে আসছিল।

ওঁর এমনটা হওয়ার কথা নয়। আর সন্ধে সাতটায় ঘর আঁধার করে বিছানায় শুয়ে পড়ার কথাও নয়।

এমনটা হয়েছে একটা কবিতার লাইন শুনে।

পাশের ঘরে ছেলে সুমিতাভকে ওর মা কবিতা মুখস্থ করাচ্ছেন। এসময়টায় সুমিতাভ মায়ের কাছে পড়তে বসে, আর সোমপ্রকাশ পাশের বেডরুমে জুত করে টিভি দেখতে বসেন।

আজও তাই বসেছিলেন, কিন্তু ওই কবিতার লাইনগুলো সব এলোমেলো করে দিল। মনটা ফিরে গেল অনেক পুরোনো সময়ে। সোমপ্রকাশ যখন সুমিতাভর বয়েসে ছিলেন। ক্লাস সিক্সে পড়তেন। গ্রামের স্কুলে।

সে প্রায় বত্রিশ-তেত্রিশ বছর আগের কথা।

বেড়ার ঘর। টালির চাল। ঘরের সামনে বড় উঠোন। উঠোনে বড়-বড় আমগাছ, জামগাছ আর কাঁঠালগাছ। একপাশে টিউবওয়েল। টিউবওয়েল ডিঙিয়ে গোয়ালঘর। গোয়ালঘরে গোরু-বাছুর।

সেসব কথা মনে পড়তেই সোমপ্রকাশ আলো-টালো নিভিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। খোলা জানলার দিকে তাকিয়ে পুরোনো দিনের ছবি দেখতে লাগলেন। গ্রামের বাড়িটা চোখের সামনে ভেসে উঠল।

সেদিনটাও ছিল শীতের রাত। সন্ধে সাতটা কি সওয়া সাতটা হবে। ছেঁড়া ফুলহাতা সোয়েটার গায়ে দিয়ে খাটের ওপরে বসে হ্যারিকেনের আলোয় পড়ছিলেন সোমপ্রকাশ। পড়ছিলেন মানে দুলে-দুলে কবিতা মুখস্থ করছিলেনঃ

‘বাঁশবাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই,
মাগো আমার শোলক-বলা কাজলা দিদি কই?’

ওঁর কাছ থেকে হাতখানেক দূরে বসে ছোটভাই জয়প্রকাশ ‘কিশলয়’ বই নিয়ে বাংলা পড়া তৈরি করছিল। ও ক্লাস ফোরে পড়ে।

একটু আগেই দু-ভাই টিফিন খাওয়া শেষ করেছে। তেল দিয়ে মাখা মুড়ি আর পেঁয়াজের টুকরো। খালি বাটি দুটো মা এখনও নিয়ে যাননি। মা রান্নাঘরে রান্না করছেন। কোলের ছোটবোনটা মায়ের কাছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও, কেন কে জানে, চেঁচিয়ে কাঁদছে। এ-ঘর থেকে সোমপ্রকাশ ছোটবোনের কান্না দিব্যি শুনতে পাচ্ছিলেন।

‘ভাই, যা তো—বোনুকে একটু ধর গিয়ে। মা-কে জ্বালাচ্ছে...।’

দাদার কথায় বারকয়েক গাঁইগুঁই করে জয় বিছানা থেকে নেমে রান্নাঘরের দিকে হাঁটা দিয়েছে কি দেয়নি, হঠাৎই শোনা গেল কয়েকজনের চিৎকার: ‘চোর! চোর!’

চিৎকারটা ভেসে এল খুব কাছ থেকেই। যেন সামনের দাওয়া কিংবা উঠোন থেকে।

সোমপ্রকাশ আর দেরি করেননি। 'চোর! চোর!' চিৎকারের সঙ্গে নিজের কচি গলার চিৎকার মিলিয়ে দিয়ে বিছানা থেকে নেমেই দে ছুট।

ঘরের দরজা খুলে বেরোনোর সময় ওঁর মনে হয়েছিল রাতের অন্ধকারে চোরের মোকাবিলা করতে গেলে যা হোক একটা হাতিয়ার সঙ্গে থাকা দরকার। তাই যেতে-যেতেই দরজার পাশে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা নিজের ক্রিকেট ব্যাটটা এক ছোবলে তুলে নিয়েছিলেন।

পিছন থেকে জয় 'দাদা! দাদা!' বলে চেঁচাচ্ছিল, কিন্তু সে-ডাকে সোমপ্রকাশ ফিরে পর্যন্ত তাকাননি।

ছোটবেলায় সোমপ্রকাশ খুব দুরন্ত এবং ডাকাবুকো ছিলেন। সবসময় অ্যাডভেঞ্চারের খোঁজ করতেন। গ্রামের হরিমোহন সরখেল স্মৃতি পাঠাগার থেকে নিয়মিত অ্যাডভেঞ্চারের বই নিয়ে আসতেন। লাইব্রেরির মেম্বার ছিলেন বাবা, কিন্তু সেই মেম্বারশিপের দৌলতে বাবার হয়ে সোমপ্রকাশই লাইব্রেরিতে যাতায়াত করতেন এবং নিজের পছন্দসই বই নিয়ে এসে গোগ্রাসে গিলতেন। বই পড়তে-পড়তে ওঁর সাহসটা বেশ শক্তপোক্ত হয়ে গিয়েছিল।

তাই এখন চোখের পলকে ঘর পেরিয়ে দাওয়া, দাওয়া পেরিয়ে অন্ধকার উঠোন।

কিন্তু কেউ তো নেই! তা হলে চিৎকারটা শোনা গেল কোত্থেকে? প্রথমবার শুনে তো মনে হয়েছিল খুব কাছ থেকেই আওয়াজটা এসেছে!

ঘরের তুলনায় বাইরের খোলা উঠোনে শীত অনেক বেশি। কিন্তু অ্যাডভেঞ্চারে সামিল হওয়ার আগ্রহে শীতের ব্যাপারটা সোমপ্রকাশের মাথাতেই ছিল না।

উঠোনের বাঁ-দিকে আম, জাম আর কাঁঠালের বড়-বড় গাছ। সেদিকটায় অন্ধকার আরও গাঢ়, আরও মিশকালো। টিউবওয়েলটাকে দেখা যাচ্ছে না।

উঠোনে কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়িয়ে ছিলেন সোম। না, ওঁর ভূত-টুতের ভয় ছিল না। বাবা সেই ছোট্ট বয়েস থেকে ওঁকে চার লাইনের একটা ছড়া শিখিয়ে দিয়েছেন। সেই ছড়ায় রাম-লক্ষ্মণ থাকায় ভূত কিছুতেই কাছে ঘেঁষতে পারবে না।

শুধু বাবা কেন, ছোটকাকা, মেজকাকা, মা—সব্বাই সোমকে একই আশ্বাস দিয়েছেন।

এখন উঠোনে দাঁড়িয়ে সোম সেই চারলাইনের ছড়াটাই মনে-মনে আওড়াচ্ছিলেন এবং অ্যাডভেঞ্চারের খোঁজে এপাশ-ওপাশ তাকাচ্ছিলেন।

ঠিক সেই সময়েই আবার 'চোর! চোর!'

এবারের সমবেত চিৎকারে গলার সংখ্যা অনেক বেশি—তাই শব্দের ডেসিবেল মাত্রাও অনেক বেশি।

চিৎকারটা সোমদের বাড়ির সামনের পথ দিয়ে ছুটে চলে গেল। চিৎকারের সঙ্গে-সঙ্গে ছুটে গেল অনেকগুলো টর্চের আলো। ছোটার তালে-তালে আলোগুলো নাচছে।

সোমপ্রকাশ আর দেরি করলেন না। অ্যাডভেঞ্চারের খোঁজ তিনি পেয়ে গেছেন।

উঠোন ঘিরে বাঁশের বেড়া। তারই এক জায়গায় বাখারি দিয়ে তৈরি বাউন্ডারি গেট—তারের হুড়কো দিয়ে আটকানো।

দু-সেকেন্ডে সেই হুড়কো খুলে সোমপ্রকাশ বেরিয়ে এলেন কাঁচা রাস্তায় এবং টর্চের আলোগুলো একটু আগে যেদিকে ছুটে গেছে সেদিকে ছুটতে শুরু করলেন।

রাস্তার দু'পাশে নানারকম গাছপালা। তাদের ডালপালায় কুয়াশার ফুল ফুটে আছে। রাস্তার কোথাও-কোথাও শালের খুঁটিতে উলঙ্গ বালব জ্বলছে।

চেনা রাস্তা ধরে ছুটলেন সোম। এই রাস্তাটা শ্রীমানীদের পুকুরের পাশ দিয়ে চলে গেছে গ্রামের প্রাইমারি স্কুলের দিকে। দু-বছর আগে সোম ওই প্রাইমারি স্কুলেই পড়তেন।

সোমপ্রকাশ ছুটোছুটির ব্যাপারে বেশ দক্ষ। স্কুলের স্পোর্টসে তিনবার ছোট-ছোট কাপ পেয়েছেন। সুতরাং একটু পরেই তিনি 'চোর! চোর!' চিৎকার করা দলটাকে ধরে ফেললেন। তখন সবাই শ্রীমানীদের পুকুরের লাগোয়া একটা বড়সড় ফাঁকা জমিতে চলে এসেছেন।

এই জমিটার চরিত্র ভারী অদ্ভুত। জমির মালিকানা শ্রীমানীদের হলেও তাঁরা এ জমির দিকে নজর দেন না। ফলে গ্রামের গরিব মানুষরা এই জমির ছোট-ছোট টুকরোয় যে-যার মরজি মতন চাষবাস করে। ফলে এই জমিতে পাঁচ-সাত রকম ফসল দেখা যায়।

'ওই যে! ব্যাটা পুকুরপাড়ের দিকে যাচ্ছে। ওই যে...।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ—দেখতে পেয়েছি...।'

টর্চের আলোয় সোম একঝলক দেখতে পেলেন একটা ছেলেকে। রোগাটে সরু চেহারা। গায়ে একটা সাদা হাফশার্ট আর কালচে হাফপ্যান্ট। একহাতে একটা ছোট প্যাকেট গোছের কিছু রয়েছে।

ছেলেটা তিরবেগে ছুটছে।

পুকুরপাড়ে অনেকগুলো বড়-বড় গাছ। তাদের পাতা বেশিরভাগটাই ঝরে গেছে। শুধু কালো-কালো ডালপালা মেলে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে। তার মধ্যে দুটো গাছ আবার হেলে পড়েছে পুকুরের ওপরে। এমনভাবে হেলে পড়েছে যেন গাছের ডালপালাগুলো পুকুরের জলের কানে-কানে কিছু বলতে চায়।

পাঁচমিশেলি খেতের ছোট-ছোট গাছ আর ভিজে মাটি মাড়িয়ে সবাই ছুটল পুকুরের দিকে।

একজন চেঁচিয়ে উঠল, 'ওই যে, ওই যে! ব্যাটা ওই গাছটায় উঠছে!' এবং একইসঙ্গে তার হাতের টর্চের আলো গিয়ে পড়ল একটা বড়সড় গাছের ওপরে। গাছটা পুকুরের ওপরে বেশ খানিকটা হেলে রয়েছে।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ—দেখা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে...!'

'ওই যে, বেয়ে ওপরে উঠছে—।'

গাছের ডালপালা আর অল্পস্বল্প পাতার ফাঁকফোকর দিয়ে সাদা শার্টের অংশ দু-এক পলকের জন্য চোখে পড়ল। তবে ছেলেটা গাছ বেয়ে ওপরে উঠছে কি না সেটা খুব স্পষ্টভাবে ঠাহর হল না।

গাছটার কাছ থেকে খানিকটা দূরে ছুটন্ত ভিড়টা থমকে দাঁড়াল। সোমপ্রকাশ খেয়াল করলেন, ভিড়টা এর মধ্যে একটু পরিপুষ্ট হয়েছে। হইচই চেঁচামেচি শুনে গাঁয়ের আরও কিছু লোক চোর-তাড়া-করা দঙ্গলে নাম লিখিয়েছে। তার মধ্যে দু-চারজন কিশোর এবং বালকও রয়েছে।

উত্তেজিত জনতা নিজেদের মধ্যে অনেক কথা বলছিল, উত্তেজনায় হাত নাড়ছিল। সেইসব কথাবার্তা থেকে সোম চোরের 'গল্প'-টা কম-বেশি উদ্ধার করলেন। সেইসঙ্গে নানান টর্চের ছিটকে পড়া টুকরো-টুকরো আলোয় এটাও দেখতে পেলেন, ওই দঙ্গলের মধ্যে ওঁর বাবা, মেজকাকা এবং ছোটকাকাও রয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে আরও বেশ কয়েকটা চেনা মুখ নজরে পড়ল। যেমন সমীরকাকু—বেনিয়ামোড়ে ওঁর সাইকেল সারানোর দোকান আছে। পরেশ রায়চৌধুরী—গাঁয়ের একমাত্র পুরুতমশাই—গৃহপ্রবেশ থেকে শুরু করে অন্নপ্রাশন, বিয়ে, কিংবা শ্রাদ্ধ—সবকিছুতেই ওঁর ডাক পড়ে। হৃদয়দা— গ্রামে ওঁর মুদিখানা দোকানটাই সবচেয়ে চালু দোকান। রঘু পোরেল—রঘুদা ঢাক বাজায়, দুর্গাপুজোয় কালীপুজোয় কলকাতায় বাজাতে যায়। ওর বাড়িতে তিনটে ঢাক আছে, সোমপ্রকাশ দেখেছেন।

'চোর! চোর!' আওয়াজ শুনে যে যেমন পোশাকে ছিলেন সেই পোশাকেই পথে নেমে এসেছেন। কেউ ফুলপ্যান্ট, কেউ লুঙ্গি, কেউ বা নিতান্ত গামছা পরে আছেন। তবে শীত ঠেকাতে গায়ে সোয়েটার, চাদর কিংবা শাল জড়ানো।

ভিড়ের মধ্যে বেশ কয়েকজনের হাতে নানানরকম অস্ত্র: যেমন, লাঠি, শাবল, উনুন খোঁচানোর বাঁকানো শিক, বাখারির টুকরো, আর এপাশ-ওপাশ থেকে কুড়িয়ে নেওয়া আধলা ইটের টুকরো।

সোমপ্রকাশ ভিড়ের মধ্যে এমনভাবে মিশে ছিলেন যাতে ওঁর বাবা অথবা কাকারা ওঁকে দেখতে না পান।

সোমদের বাড়ির দু'পাশে ওঁর দু-কাকার বাড়ি। তার মধ্যে ছোটকাকার বাড়ির ওপাশে মিত্যুনকাকুর বাড়ি। মিত্যুনকাকু পেট্রোল-পাম্পে চাকরি করেন। ওঁর বাড়িতেই চুরির ঘটনাটা ঘটেছে।

মিত্যুনকাকুর দাওয়াতে অনেকরকম জিনিস একজায়গায় জড়ো করে রাখা ছিল। মুদিখানার জিনিস আর টুকিটাকি খাওয়ার জিনিস। সেখান থেকেই এই চোর কীসের একটা প্যাকেট তুলে নিয়ে পালায়। মিত্যুনকাকুর স্ত্রী ছেলেটাকে উঠোনের ওপর দিয়ে ছুটে পালাতে দেখেন এবং 'চোর! চোর!' বলে চিৎকার করে ওঠেন। তারপরই শোরগোল শুরু হয়ে যায়। মিত্যুনকাকু চিৎকার করতে-করতে ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসেন। এবং ওঁর চিৎকারে আশপাশের লোকজন ছুটে এসে জড়ো হয়ে যায় এবং ছেলেটা যেদিকে ছুটে পালিয়েছে সেদিক লক্ষ্য করে দৌড়োতে শুরু করে।

সোমপ্রকাশের দু-কাকা ঘরেই ছিলেন। ফলে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে 'সার্চ পার্টি'-তে জয়েন করতে ওঁদের দেরি হয়নি। তবে সোমের বাবার ছুটে আসতে একটু সময় লেগেছে, কারণ তিনি কালীতলার মন্দিরের চাতালে বসে তাস খেলছিলেন। মন্দিরের দরজা দিয়ে উপচে পড়া আলোয় তাস পেতে রোজ সন্ধেবেলায় এই আসর বসে।

সোমপ্রকাশদের গ্রামে সবার জীবনই খুব শান্ত ছন্দে চলে। সে-চলায় কখনও কোনও ঢেউ ওঠে না। সেই কারণেই বোধহয় জীবনগুলো একটু একঘেয়ে ম্যাড়মেড়ে হয়ে গিয়েছিল। তাই ওই সন্ধেবেলার উত্তেজনার ঢেউটা চুম্বকের মতো টানে সব্বাইকে টেনে নামিয়েছে শীতের রাস্তায়। বোধহয় শীতের রাতে সবাই একটু উত্তেজনার ওম পেতে চাইছিল।

সন্দেহজনক গাছটা লক্ষ্য করে কেউ একজন একটা আধলা ইট ছুড়ে মারল। অনেকে বোধহয় এই মুহূর্তটার জন্যই অপেক্ষায় ছিল। কারণ, প্রথম ইটটা বাতাস কেটে রওনা হতেই তার পিছু-পিছু পরপর কয়েকটা ইট গাছ লক্ষ্য করে উড়ে গেল। দু-চারটে ইট গাছে লাগল, বাকিগুলো এদিক-সেদিক দিয়ে উড়ে গিয়ে অন্ধকার পুকুরের জলে পৌঁছে তাদের উড়ান শেষ করল।

চোরটার গায়ে যে একটা ইটও লাগেনি সেটা সবাই বুঝতে পারল। সেইজন্যই হয়তো বেশ কয়েকজন জমির কিনারায় গিয়ে এদিক-ওদিক টর্চের আলো ফেলে নতুন ইটের টুকরোর সন্ধান করতে লাগল।

সোমপ্রকাশ শুনছিলেন, চোর ছেলেটার হাতে কী-কী অস্ত্র থাকতে পারে সে নিয়ে বিস্তর আলোচনা চলছে। অনেক তর্কবিতর্কের পর সকলে সিদ্ধান্তে এলেন যে, ছেলেটার কাছে ছুরি অথবা পিস্তল থাকাটাই স্বাভাবিক, কারণ, এই অস্ত্র দুটো হাফপ্যান্টের পকেটেও লুকিয়ে রাখা যায়।

এই জটলার মধ্যে অনেকেই বারবার মিত্যুনকাকুকে জিগ্যেস করছিলেন, 'কী চুরি হয়েছে? কী চুরি হয়েছে?'

মিত্যুনকাকু দু-চারবার ঢোঁক গিলে বললেন, 'টাকা...টাকা। একটা প্যাকেটে প্রায় শ' দেড়েক টাকা ছিল...।'

সত্যিই তো, চুরিটা তা হলে নেহাত চাট্টিখানি ব্যাপার নয়! অতগুলো টাকা বলে কথা!

জটলার মধ্যে বেশ কয়েকজন হা-ডু-ডু খেলার মতন সতর্ক ভঙ্গিতে গাছটার দিকে এগোচ্ছিল। তাদের সকলের হাতেই টর্চ, আর ছোট কিংবা বড় হাতিয়ার।

পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা লোকজনের ভিড় থেকে আরও দু-একটা বড়সড় ঢেলা ছুটে গেল গাছ লক্ষ্য করে। চোর ছেলেটাকে ভয় দেখানোর জন্য 'চোর! চোর!' 'ধর ব্যাটাকে!' 'মার ব্যাটাকে!' ইত্যাদি নানানরকম চিৎকার শোনা যেতে লাগল। কেউ-কেউ বলতে লাগল, 'বদমাশটাকে একবার হাতে পেলে হয়! পিটিয়ে ছালচামড়া গুটিয়ে নেব।'

সাহসী যে-কয়েকজন গাছের কাছে এগিয়ে গিয়েছিল তাদের মধ্যে দুজন তরতর করে গাছ বেয়ে উঠতে শুরু করল। তাদের সুবিধের জন্য গাছের ডালপালায়, তাদের বেয়ে ওঠার পথে, টর্চের আলো ফেলতে লাগল কয়েকজন। একইসঙ্গে হইচই চেঁচামেচিও চলতে লাগল।

তারই মধ্যে আচমকা 'ঝপাং'।

এই শীতের রাতে চোরবাবাজি পুকুরে ঝাঁপ দিয়েছে।

একজন বলল, 'কী সাংঘাতিক! এই ঠান্ডায় পুকুরের জলে কেউ ঝাঁপ দেয়!'

উত্তর পাওয়া গেল প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই: 'হ্যাঁ—দেয়। চোররা দেয়। ওদের চামড়া বেজায় মোটা। ঠান্ডায় ওদের কিস্যু হয় না।'

চোর ছেলেটি পুকুরে ঝাঁপ দেওয়ায় জনগণ বেশ অ্যাডভান্টেজ পেয়ে গেল। হইহই করে পুকুরপাড় বরাবর ছড়িয়ে গিয়ে পুকুরের জলে ঢিল মারতে লাগল। টর্চের অনেকগুলো আলো চোর ছেলেটাকে তাক করে চলে বেড়াচ্ছে। আর চোর ঠান্ডা জলের পুকুরে পাগলের মতো, কিংবা জলে পড়া ইঁদুরের মতো এলোমেলো সাঁতার কাটছে। তারই মধ্যে দেখা গেল ছেলেটা ওর বাঁ-হাতটা জলের ওপরে সামান্য উঁচু করে আছে। আর সেই হাতে একটা সাদাটে প্যাকেট না কী যেন!

পুকুরের জলে বৃষ্টির মতো ঢিল পড়ছিল। তার বেশ কয়েকটা মনে হয় ছেলেটার গায়ে-মাথায় লাগল। কিন্তু কোনও যন্ত্রণার চিৎকার শোনা গেল না পুকুরের জল থেকে। হয়তো সে-চিৎকার এতই চাপা যে, কারও কানে পৌঁছোনোর মতন নয়।

অন্ধকারে মাছের মতো সাঁতার কাটছিল ছেলেটা। জল কেটে-কেটে ও পশ্চিম পাড়ে উঠে পড়ল। ভিজে জামা গায়ে লেপটে আছে। হাফপ্যান্ট থেকে টপটপ করে জল পড়ছে। ও হয়তো ঠান্ডায় ঠকঠক করে কাঁপছিল, কিন্তু টর্চের আলো-ছায়ায় সেটা ভালো করে বোঝা গেল না।

পাড় বেয়ে আগাছার ঝোপঝাড় ঠেলে সরিয়ে ও আবার ছুটতে শুরু করল। চিৎকার করতে-করতে জনগণ তাড়া করল ওকে।

ছেলেটা যেদিকে দৌড়চ্ছে সেদিকে কয়েক বিঘে জুড়ে সনাতন নাহাদের বাঁশবাগান। বাঁকা চাঁদের আলো এসে পড়েছে সেই বাগানে। এদিক-ওদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে মাথা তুলে আছে কালো-কালো বাঁশঝাড়।

পুকুর ছাড়িয়ে এদিকটায় আসামাত্রই তাপমাত্রা যেন আরও দু-এক ডিগ্রি নেমে গেল। সোমপ্রকাশ এবার শীতটা ভালোরকম টের পেলেন।

কয়েকটা বাঁশঝাড়কে এঁকেবেঁকে পাশ কাটিয়ে রোগাসোগা ছেলেটা আচমকা একটা বাঁশঝাড়ের ভেতরে সেঁধিয়ে গেল। ব্যাপারটা খুব দ্রুত ঘটলেও ওর পিছু ধাওয়া করা দঙ্গলের দু-তিনজন সেটা খেয়াল করল।

'এইখানে! এইখানে! এই বাঁশঝাড়টার ভেতরে লুকিয়েছে! এই যে—এটার ভেতরে...।' কয়েকজন উঁচু গলায় শোরগোল শুরু করল।

সেই বিশেষ বাঁশঝাড়টাকে ঘিরে লোকজন ভিড় জমাল। সবক'টা টর্চের আলো বাঁশঝাড়ের ওপরে গিয়ে পড়ল।

এতক্ষণ ধরে ব্যবহারের ফলে টর্চের আলোগুলো বেশ হলদেটে আর মলিন হয়ে গেছে। কিন্তু সেই স্তিমিত আলোতেও ছবিটা দেখা গেল।

বাঁশঝাড় থেকে লম্বা-লম্বা বাঁশ ফোয়ারার মতো মাথা তুলেছে। দুটো বাঁশ তো এতটাই লম্বা যে, আকাশে অধিবৃত্ত এঁকে ঝুঁকে পড়েছে অন্ধকার মাঠের দিকে।

শীতের সময়। বাঁশগাছের সব পাতাই প্রায় খসে পড়েছে। বাঁশগাছগুলো কঙ্কালের হাতের আঙুলের মতন দেখাচ্ছে। ওপরদিকে আঙুলগুলো ফাঁক-ফাঁক দেখালেও নীচের দিকে এসে জট পাকিয়ে গেছে। এ ছাড়া বাঁশঝাড়ের গোড়ায় জমে আছে, ছড়িয়ে আছে, অসংখ্য শুকনো বাঁশপাতা।

দেখা গেল, অনেক বাঁশের জটলার মধ্যে ছেলেটা একটা বাঁশ জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মাথাটা নীচের দিকে ঝুঁকে আছে। থরথর করে কাঁপছে।

লোকজন অন্ধকারে বেশি কাছে এগোতে সাহস পেল না। কে জানে, ছেলেটার সঙ্গে কী না কী অস্ত্র আছে! তাই একটা নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে তারা চেঁচামেচি করতে লাগল, নানান হুমকি দিতে লাগল।

আবার কেউ-কেউ ঢিল ছুড়তে লাগল।

ব্যাপারটা সোমপ্রকাশের ভালো লাগছিল না।

অথচ চোরকে তাড়া করে বেড়ানোর এই আধঘণ্টা কি চল্লিশ মিনিট সময়ের মধ্যে দুবার কি তিনবার ওঁর মনে হয়েছিল, হাতের ক্রিকেট ব্যাটটা চোরকে লক্ষ্য করে ছুড়ে মারেন।

এখন সে-কথা মনে পড়ে ওঁর খারাপ লাগল।

চারপাশে অন্ধকার আর শীত। বাঁশবাগানের এখানে-ওখানে কুয়াশা দিয়ে তৈরি হাওয়ামিঠাই ভাসছে। আকাশে ফ্যাকাশে সরু চাঁদ।

সোমপ্রকাশ ছোট-ছোট ছেলেদের ভিড়ে নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে বড়-বড় লোকদের দেখছিলেন। বাবা, মেজকাকা, ছোটকাকা, সমীর-কাকু, ঠাকুরমশাই, মিত্যুনকাকু, হৃদয়দা, রঘুদা—এ ছাড়া আরও অনেক চেনা-অচেনা মুখ। তাদেরই কেউ-কেউ চোরকে লক্ষ্য করে হুঙ্কার ছাড়ছে।

'এই ছোঁড়া, বেরিয়ে আয়—বেরিয়ে আয় বলছি!'

'ফাঁড়িতে একটা খবর দিলে হয় না? পুলিশের ডান্ডা খেলে ব্যাটা সিধে হয়ে যাবে...!'

'এই শীতে ওর কষ্ট হচ্ছে না?' কে একজন প্রশ্ন করল—যে-প্রশ্নটা অনেক আগেই করা উচিত ছিল।

উত্তরে আর-একজন দুরছাই ঢঙে জবাব দিল, 'হুঁ! চোরদের আবার শীত! দেখলেন না, পুকুরের ঠান্ডা জলে সাঁতরে দিব্যি উঠে এল!'

'টাকার প্যাকেটটা উঁচু করে ধরে রেখেছিল—যাতে জলে না ভেজে।'

'বাঁশঝাড়ের মধ্যে কেমন নিশ্চিন্তে ঘাপটি মেরে আছে—ব্যাটার সাপখোপের ভয়ও নেই।'

'এই শীতে সাপ আর কোথায়! সব তো গর্তে সেঁধিয়ে আছে...।'

'অ্যাই, বেরো—বেরিয়ে আয়! চুপচাপ যদি বেরিয়ে আসিস তা হলে কিচ্ছু বলব না। আয়, বেরিয়ে আয়...।'

কিন্তু এসব কথায় চোর ছেলেটা তেমন কর্ণপাত করল বলে মনে হল না। বাঁশ আঁকড়ে মাথা ঝুঁকিয়ে দাঁড়িয়েই রইল—যেন একটা পাথরের মূর্তি। তবে ওর শরীরটা উঁচু কম্পাঙ্কে কাঁপছিল।

রাত ক্রমে বাড়ছিল। বড়রা নিজেদের মধ্যে নানান আলোচনা করছিল। আলোচনার মূল বিষয় ছিল: এখন কী করা যায়? এভাবে তো আর সারারাত দাঁড়িয়ে থাকা যায় না।

বেশ কিছুক্ষণ তর্কবিতর্কের পর ঠিক হল, ছ'জন এই বাঁশঝাড়টাকে ঘিরে পাহারা দেবে। এবং পালা করে এই পাহারা চলবে ভোর পর্যন্ত। তারপর সকালবেলা চোরটাকে টেনে বের করে একটা হেস্তনেস্ত করা হবে। মিত্যুনবাবুর টাকাটা যে করে হোক উদ্ধার করতে হবে।

ব্যস, লাঠিসোঁটা নিয়ে ছ'জন জোয়ান বাঁশঝাড়টাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে পড়ল। খোলা জায়গায় শীত ঠেকানোর জন্য কয়েকজন তাদের চাদর-শাল ইত্যাদি ওই ছ'জনকে ধার দিলেন। কোন দলের পর কোন দল পাহারা দেবে সেসব আলোচনাও করে নিল বড়রা। তারপর সবাই ফেরার পথ ধরল।

সোমপ্রকাশও বাবা-কাকার নজর এড়িয়ে বাড়ির পথ ধরেছিলেন। অন্ধকার রাস্তা ধরে ছুটে যাওয়ার সময় ঝিঁঝির শব্দ কানে এসেছিল, আর কয়েক ঝাঁক জোনাকির সঙ্গে সোমের দেখা হয়েছিল।

বাড়ি ফিরে মা-কে প্রথমে ম্যানেজ করেছিলেন সোমপ্রকাশ। চোর ধরার রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চারের গল্প মা-কে শুনিয়েছিলেন। তারপর খাওয়াদাওয়া সেরে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়েছিলেন—কারণ, কাল ভোরবেলা তো আবার ওই বাঁশবাগানে যেতে হবে!

চোখ বুজে শুয়ে থাকলেও বাঁশঝাড়ের মধ্যে লুকিয়ে থাকা চোরের ছবিটা সোম যেন দেখতে পাচ্ছিলেন। ছবিটা কিছুতেই সরতে চাইছিল না।

পরদিন ভোর সাড়ে পাঁচটায় সোমপ্রকাশের আবার এক অ্যাডভেঞ্চার।

বাবা বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতেই সোম চুপিসাড়ে তৈরি হলেন। তারপর ঘুমন্ত মা-কে ফাঁকি দিয়ে সোজা বাড়ির বাইরে।

ভোরের কুয়াশা সরিয়ে সোম বাঁশবাগানের দিকে চললেন। অন্ধকার সবে ফিকে হতে শুরু করেছে। আলো ফুটছে আকাশে। কিন্তু আকাশে উজ্জ্বল চাঁদ দেখা যাচ্ছে। মাঝ-আকাশ থেকে বেশ খানিকটা ঢলে পড়েছে পশ্চিমে।

ভোরের শীত ঠেকাতে সোয়েটারের ওপরে মায়ের একটা শাল জড়িয়ে নিয়েছেন সোম।

বাঁশবাগানের কাছাকাছি এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। কাল রাতের বাঁশঝাড়টাকে ঘিরে প্রায় বারো-চোদ্দোজন লোক জড়ো হয়ে গেছে। হাতে লাঠিসোঁটা আর টর্চ। কিন্তু সেখানে কোনও ছোট ছেলে নেই।

দৃশ্যটা সোমপ্রকাশের মনে চিরকাল বেঁচে থাকবে।

বাঁশবাগানের মাথার ওপরে বাঁকা চাঁদ। চারপাশ ঠান্ডা, শান্ত। অসংখ্য বাঁশঝাড় কাছাকাছি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে—যেন সব ভাই-ভাই। তারই একটাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে চোর-শিকারির দল।

বাবার নজর এড়াতে আসল বাঁশঝাড়টার পাশের একটা বাঁশঝাড়ের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালেন সোম। বাঁশের কাটাকুটির ফাঁকফোকর দিয়ে সব দেখতে লাগলেন, শুনতে লাগলেন।

ভোরের আলো ফুটেছে। তার সঙ্গে-সঙ্গে শিকারিদের সাহসও বেড়েছে। বাঁশঝাড়টার খুব কাছে এগিয়ে গিয়ে তারা এখন ছেলেটাকে লাঠির খোঁচাখুঁচি দিচ্ছে। শাসাচ্ছে, ভয় দেখাচ্ছে, এমনকী পিটিয়ে মেরে ফেলার হুমকিও দিচ্ছে।

ছেলেটা সেই একইরকমভাবে দাঁড়িয়ে। একটা বাঁশকে জড়িয়ে ধরে আছে। শুধু মাথাটা কাল রাতের তুলনায় আরও বেশি ঝুঁকে পড়েছে।

ছেলেটা এখন আর শীতে কাঁপছে না।

সাহস করে মিত্যুনবাবু ওকে লাঠি দিয়ে জোরালো একটা খোঁচা দিলেন। ছেলেটা সঙ্গে-সঙ্গে কাত হয়ে গেল। হেলে পড়ল একজোড়া বাঁশের ওপরে।

'ব্যাটা ঠান্ডায় অজ্ঞান হয়ে গেল নাকি?'

'দেখুন, দেখুন—মিত্যুনবাবুর প্যাকেটটা এখনও হাতে ধরে আছে। মিত্যুনবাবু, আপনি খুব লাকি—আপনার টাকা ফেরত পেয়ে গেলেন। ব্যাটা ওটা হজম করতে পারেনি—।'

সকলে সেই কথায় সায় দিয়ে 'হ্যাঁ, হ্যাঁ' করে উঠল।

আরও কিছুক্ষণ খোঁচাখুঁচির পর সবাই যখন বুঝতে পারল ছেলেটা একেবারে নিস্তেজ, তখন তারা ওর কাছে এগিয়ে গেল। ওকে ধরে চ্যাংদোলা করে বাঁশঝাড়ের ভেতর থেকে বের করে নিয়ে এল বাইরে। শুইয়ে দিল মাটিতে।

এবং সবাই চমকে উঠল—একেবারে ভূত দেখার মতো।

এ তো বোবা কানাই! বেনিয়ামোড়ের কাছে নরসিং জানার চায়ের স্টলের পাশে বসে ভিক্ষে করে!

সেইজন্যই কাল রাত থেকে ও কোনও কথা বলেনি—বলতে পারেনি।

ঝুঁকে পড়ে ওকে পরীক্ষা করল কয়েকজন। হাত রাখল নাকের নীচে, কানের নীচে। একজন তো ছেলেটার বুকে কান চেপে ধরল।

তারপর, ধীরে-ধীরে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল সবাই। না, কানাই আর বেঁচে নেই।

মিত্যুনকাকু হঠাৎই নীচু হয়ে কানাইয়ের ডানহাতে ধরা কাগজের প্যাকেটটা নিতে হাত বাড়ালেন। কিন্তু তার আগেই কৌতূহলী আর-একজন প্যাকেটটা তুলে নিয়ে খুলতে শুরু করেছে।

কে একজন বলল, 'যাক, মিত্যুন—তোমার টাকাটা শেষ পর্যন্ত উদ্ধার হল...।'

ততক্ষণে প্যাকেট খোলা হয়ে গেছে। প্যাকেট বলতে সাধারণ কাগজের ঠোঙা—কয়েকটা ভাঁজ দেওয়া।

প্যাকেট খুলতেই সবাই আরও অবাক।

প্যাকেট থেকে বেরিয়ে পড়েছে টাকা নয়—কয়েকটা হাতে গড়া আটার রুটি।

সবাই অবাক চোখে মিত্যুনবাবুর দিকে তাকাল।

মিত্যুনবাবু তখন চোখ নামিয়ে মাথা নীচু করে ফেলেছেন।

সোমের বাবা বললেন, 'মিত্যুন, তুমি এত বড় মিথ্যুক! চুরিটাকে বড় করে দেখানোর জন্যে এরকম মিথ্যে কথা বললে! তোমার মিথ্যের জন্যে একটা ছেলের...একটা ছেলের প্রাণ গেল!'

মিত্যুনবাবু একেবারে চুপ। মাথা নীচু।

শুধু মিত্যুনবাবু কেন, কানাইয়ের মৃতদেহ ঘিরে সবাই মাথা নীচু করে দাঁড়িয়েছিল। দেখে মনে হচ্ছিল, কানাই নয়, ওরা ওদের বিবেকের মৃতদেহ ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওরাই যেন আসলে চোর—কানাই ওদের হাতেনাতে ধরে ফেলেছে।

চাঁদ যখন ডাকে

গরমের ছুটিতে হোমটাস্ক দেওয়াটা সব স্কুলেরই রেওয়াজ। বুয়ানের স্কুলও এই রেওয়াজের বাইরে নয়। কিন্তু বুয়ানকে দেখলে মনে হবে ওর মাথায় হোমটাস্কের কোনও চাপ নেই। গরমের ছুটিটা ওকে দেওয়া হয়েছে শুধুই খেলাধুলোর জন্য, গল্পের বই পড়ার জন্য, ডাইনোসর আর মহাকাশের বই পড়ার জন্য, টিভিতে ডোরেমন, রোল নাম্বার টুয়েন্টি ওয়ান কিংবা মোটু-পাতলু দেখার জন্য এবং পলিমারের খুদে-খুদে রঙিন টুকরো জুড়ে নানান জিনিস তৈরি করার জন্য।

পলিমারের টুকরো জুড়ে হরেক জিনিস তৈরির যে-ব্যাপারটা সেটা পুরোনো আমলের 'মেকানো'-রই একটা আধুনিক সংস্করণ। এগুলোর চলতি নাম 'ব্লক'। সহজ থেকে কঠিন—নানান লেভেলের ব্লক কিনতে পাওয়া যায় দোকানে। গত ছ'-আটমাস ধরে এই ব্লকের নেশাই বুয়ানকে মশগুল করে রেখেছে। বাবা-মায়ের সঙ্গে কোনও শপিং কমপ্লেক্সে গেলেই ওর আবদার: 'বাপি, একটা ব্লক কিনে দাও!'

দিনদশেক আগে মা-বাবার সঙ্গে শপিংমলে গিয়ে একই আবদার করেছে বুয়ান।

তখন রণবীর বলেছেন, 'কেন, বুয়ান? তোমার তো অনেকগুলো ব্লক রয়েছে!'

'ওগুলো বারবার তৈরি করে একদম মুখস্থ হয়ে গেছে। আর ওগুলো নিয়ে খেলতে ভালো লাগে না। টু ইজি, টু বোরিং...।'

মা শ্রেয়সী তখন ছেলের পক্ষ নিয়ে বলেন, 'দাও না নতুন একটা কিনে! পুরোনোগুলো আর কতবার খুলবে আর কতবার তৈরি করবে?'

কথাটা ঠিকই। ব্লকের বাক্সের ভেতরে রঙিন টুকরোগুলোর সঙ্গে যে-জিনিসটা তৈরি করতে হবে তারও রঙিন ছবি দেওয়া থাকে। একটা নয়, অনেকগুলো ছবি। সেই ছবিগুলো বুঝিয়ে দেয় কীভাবে জিনিসটাকে ধাপে-ধাপে তৈরি করতে হবে।

বুয়ান শুরু করেছিল খুব সহজ ব্লক দিয়ে। যেমন, কুকুর, বেড়াল, মাছ, বাড়ি এইসব। তারপর ও তৈরি করেছে ট্রেন, প্লেন, ট্র্যাক্টর, তাজমহল, জাহাজ, ক্রেন—আরও কত কী! এখন ও বলতে গেলে ব্লক-এক্সপার্ট। তৈরি করার জিনিসটা যত কঠিন হবে, ব্লকের বাক্সে পলিমারের টুকরোর সংখ্যা হবে তত বেশি, তার বাক্সটাও হবে বেশ বড়, আর জিনিসটার দামও হবে বেশি। ফলে রণবীর আর শ্রেয়সী এখন বুয়ানের জন্য নতুন কোনও ব্লক কিনতে বেশ কিন্তু-কিন্তু করেন।

রণবীর ছেলের মাথায় হাত-টাত বুলিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করলেন, 'শোন, তোর এখন ক্লাস ফাইভ। পড়ার চাপ কত বেড়ে গেছে! তুই কত বড় হয়ে গেছিস! এখন এইসব ব্লক-টক নিয়ে খেলা তোর মানায়!'

বুয়ান ছলছলে চোখে মায়ের দিকে তাকাল। আঙুল তুলে দেখাল দোকানের একটা র‍্যাকের দিকে। সেখানে পরপর ব্লকের বাক্স সাজানো—ছোট-বড় নানান বাক্স। তারই মধ্যে একটা বড় বাক্স লক্ষ্য করে আঙুল তুলেছে বুয়ান। সেই বাক্সটার ওপর খুব সুন্দর একটা রোবটের ছবি। ছবির ওপরে ইংরেজিতে লেখা রয়েছে 'রোবট-ফ্রেন্ড জুনো'। আরও লেখা আছে যে, এটা টকিং রোবট—অর্থাৎ, জুনো কথা বলতে পারে। ওর শরীরে ব্যাটারি লাগানোর ব্যবস্থা আছে। এ ছাড়া রয়েছে স্পেশাল রিমোট কন্ট্রোল ইউনিট।

বাক্সের ওপরে জুনোর রঙিন ছবিটা এত জীবন্ত যেন বুয়ানের দিকে তাকিয়ে আছে এবং হাসছে।

সুতরাং অন্যান্যবারের মতো এবারেও বুয়ানের আবদারের কাছে রণবীর-শ্রেয়সী হেরে গেলেন। রোবট-ফ্রেন্ড জুনো চলে এল ওদের বাড়িতে। আর তারপর? তারপর নাওয়া-খাওয়া মাথায় উঠল বুয়ানের।

সেইসঙ্গে পড়াও। রোবট-ফ্রেন্ডের ব্লক নিয়ে ও মেতে উঠল। বাক্সের ভেতরে দেওয়া ছবি দেখে-দেখে পলিমারের টুকরোগুলো একের পর এক জুড়তে লাগল। ধাপে-ধাপে তৈরি হতে লাগল জুনো।

যে-সন্ধেয় ব্লকের বাক্সটা ও কিনে এনেছিল তারপর চব্বিশ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই বুয়ানের কাজ শেষ। ওর পড়ার টেবিলে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক রংচঙে রোবট। উচ্চতায় আট ইঞ্চি মতন। কী সুন্দর দেখতে! বড়-বড় গোল-গোল চোখ। মাথায় কালো টুপির মতো চুল। নীল রঙের জামা। লাল রঙের প্যান্ট। বুকে লাগানো রয়েছে ছোট-ছোট রঙিন এল. ই. ডি.। হাত আর পা মেটালিক। তাতে অনেকগুলো জয়েন্ট। জয়েন্ট রয়েছে কাঁধ আর গলাতেও।

সবমিলিয়ে জুনোকে দেখলেই আদর করতে ইচ্ছে করে।

রোবট তৈরির কাজ শেষ হওয়ার পর মা-বাবাকে ডেকে নিয়ে এল বুয়ান।

‘দ্যাখো, দ্যাখো, জুনোকে কী সুন্দর দেখতে!’

রণবীর আর শ্রেয়সী হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন রোবটটার দিকে। সত্যিই ভীষণ আদুরে আর সুন্দর দেখতে জুনোকে।

রণবীর বললেন, ‘যাকগে। রোবট চেয়েছিলে, পেয়ে গেছ। এবার তো একটু পড়াশোনায় বোসো! কাল বিকেলের পর আমার কাছে ম্যাথস নিয়ে বসবে।’

শ্রেয়সী ছেলেকে বললেন, ‘কাল সকাল দশটায় ম্যাডাম পড়াতে আসবেন তোর মনে আছে তো? ম্যামের কাছে হোমটাস্কের কাজ যতটা পারবি এগিয়ে নিবি—!’

বুয়ান একেবারে অন্য জগৎ থেকে মায়ের দিকে শূন্য চোখে তাকাল। হোমটাস্ক! সেটা আবার কী জিনিস?

‘কী রে, অমন হাঁ করে চেয়ে আছিস কেন? হোমটাস্ক! হোমটাস্ক! জুনোকে পেয়ে সব ভুলে গেলি?’

সত্যিই মনে-মনে রোবটদের জগতে চলে গিয়েছিল বুয়ান। মায়ের কথায় ঝটকা খেয়ে ফিরে এল পড়াশোনার রুক্ষ বাস্তবে। চটপট ঘাড় নেড়ে বলল যে, কাল ও ম্যামের কাছে অনেকখানি হোমটাস্ক সেরে নেবে।

তারপর কাঁচুমাচু মুখে রণবীরের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘বাপি, মোড়ের মাথায় সুরেনকাকুর দোকান থেকে এইরকম চারটে ব্যাটারি এনে দেবে? প্লিজ!’

বাক্সের গায়ে ব্যাটারির ছবি দিয়ে মাপ লেখা ছিল। সেটা রণবীরকে দেখাল বুয়ান।

রণবীর ছোট্ট করে ‘হুঁ’ বললেন, তারপর: ‘ব্যাটারি এনে দিচ্ছি, কিন্তু লেখাপড়ার কথাগুলো ভুলে যেয়ো না।’

একগাল হাসল বুয়ান। বলল, ‘জানো, বাপি, ব্যাটারি লাগিয়ে দিলেই জুনো হেঁটে-চলে বেড়াবে, কথাও বলবে!’

আশ্চর্য! রোবট পেয়ে ছেলেটা সব ভুলে গেল না কি?

রণবীর বললেন, ‘ব্যাটারি তো হবে, কিন্তু পড়ার কথাগুলো তুই শুনতে পেয়েছিস তো?’

‘শুনেছি, শুনেছি!’ ব্যস্তভাবে বলল বুয়ান। তারপর বাপিকে ছোট্ট ঠেলা মেরে বলল, ‘যাও না, বাপি, ব্যাটারিগুলো এনে দাও না তাড়াতাড়ি!’

রণবীর আর দেরি না করে ব্যাটারি কিনতে বেরোলেন।

পড়ার টেবিলের সব বইপত্র সরিয়ে প্রথমেই জুনোর চলা-ফেরার জায়গা তৈরি করল বুয়ান। তারপর টেবিলের ওপরে জুনোকে দাঁড় করিয়ে ওর রিমোটের বোতামগুলো দেখতে লাগল। সেখানে ‘মুভ’, ‘স্টপ’, ‘স্লিপ’, ‘টক’ ইত্যাদি বেশ কয়েকটা বড় মাপের বোতাম রয়েছে। এক-একটা বোতামের এক-একরকম রং। প্রত্যেকটা বড় বোতামের সঙ্গে রয়েছে তিনটে কি চারটে করে ছোট-ছোট বোতাম। যেমন, ‘মুভ’ বোতামের

ঠিক ওপরেই রয়েছে চারটে ছোট বোতাম। বোতামে লেখা রয়েছে 'মোড ওয়ান', 'মোড টু' ইত্যাদি। বোঝাই যাচ্ছে, এই বোতামগুলো রোবটের মুভমেন্টের স্টাইল সিলেক্ট করার জন্য।

বুয়ান 'মুভ' লেখা সুইচটা অন করে দিল। সঙ্গে-সঙ্গে জুনো চলতে শুরু করল।

ওঃ, কী অদ্ভুত ওর চলার ধরন! সদ্য হাঁটতে শেখা বাচ্চা ছেলের মতো একটু সময় নিয়ে একটা-একটা করে পা ফেলছে। একইসঙ্গে মাথাটা এপাশ-ওপাশ ঘুরিয়ে গোল-গোল চোখজোড়া মেলে কী দেখছে ও-ই জানে!

রোবটটার চোখের মণির জায়গায় সাদা রঙের এল. ই. ডি. লাগানো ছিল। সুইচ অন করে দিতেই সেই আলোগুলো এখন উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছে। তার সঙ্গে বুকের এল. ই. ডি.-গুলো দপদপ করে জ্বলছে-নিভছে।

বুয়ান মুগ্ধ চোখে জুনোর চলা-ফেরা দেখছিল। ওর চলার সময় মোটরের আওয়াজ প্রায় শোনাই যাচ্ছে না। বাপি বলেছেন, রোবটের চলার জন্য মোটর ব্যবহার করা হয়। জুনোর মোটরটা নিশ্চয়ই খুব হাই-ফাই, তাই আওয়াজ কম।

কিন্তু আরও একটা ব্যাপার বুয়ানকে খুব অবাক করল। হাঁটতে-হাঁটতে জুনো যখন টেবিলের কিনারার কাছে পৌঁছে যাচ্ছে তখনই ও থমকে দাঁড়াচ্ছে নিজে থেকেই। তারপর ডানদিকে ঘুরে আবার চলতে শুরু করছে। কী করে রোবটটা বুঝতে পারছে যে, ও টেবিলের কিনারায় এসে গেছে—আর এগোলেই ও টেবিল থেকে নীচে পড়ে যাবে?

এই জিজ্ঞাসার উত্তর জানতে বুয়ান চেঁচিয়ে ডেকে উঠল, 'বাপি! বাপি! মা! মা! শিগগির আমার পড়ার ঘরে এসো...।'

ওর ডাকে তাড়াহুড়ো করে চলে এলেন দুজনেই। কিছুক্ষণ ওঁরা অবাক বিস্ময়ে জুনোর চলে বেড়ানো দেখলেন। তারপর বুয়ানের প্রশ্নের উত্তরে রণবীর বললেন, 'শোন, জুনোর চোখে অপটিক্যাল সেন্সর লাগানো রয়েছে। সেই সেন্সর বুঝতে পারছে যে, টেবিলের সারফেসটা শেষ হয়ে গেছে—সুতরাং আর এগোনো ঠিক হবে না। সেই সিগন্যালটা চলে যাচ্ছে জুনোর ভেতরের কম্পিউটার-ব্রেইনে। ব্রেইন জুনোর মোটরকে থামিয়ে দিচ্ছে—তারপর ওর চলার দিক ডানদিকে, নব্বই ডিগ্রি ঘুরিয়ে দিচ্ছে। সবমিলিয়ে খুব কমপ্লিকেটেড ব্যাপার...।'

কমপ্লিকেটেড ব্যাপার যে তাতে সন্দেহ নেই।

রোবট-ফ্রেন্ড জুনোর নতুন বাক্সটা বাড়িতে এনে খোলার পর একটা মোটাসোটা 'অপারেটিং ম্যানুয়াল' দেখতে পেয়েছিল বুয়ান। মা আর বাপিকে ও ম্যানুয়ালটা পড়ে ফেলার দায়িত্ব দিয়েছিল। শ্রেয়সী আবার সেটা কায়দা করে রণবীরের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছিলেন। অগত্যা রণবীর স্কুল-কলেজের পড়াশোনার মতো সেটা স্টাডি করেছেন এবং সাধ্যমতো বুয়ানের খটোমটো প্রশ্নের থতোমতো জবাব দিয়েছেন।

শ্রেয়সী বুয়ানকে জিগ্যেস করলেন, 'কী রে, তোর হোমটাস্ক কতটা এগোল?'

'হবে, মা। জুনোর ব্যাপারটা এই তো সবে কমপ্লিট হল। কাল থেকে আমার হোমটাস্ক স্টার্ট—।'

রণবীর হেসে বুয়ানের মাথায় একটা আদরের চাঁটি মেরে বললেন, 'দেখা যাক, কাল থেকে তোমার হোমটাস্ক স্টার্ট হয় কি না। নইলে জুনোকে আবার দোকানে রিটার্ন করে দেব—।'

'সত্যি বলছি, বাপি, কাল থেকে হোমটাস্ক স্টার্ট করবই। গড প্রমিস।'

শ্রেয়সী স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই রোবটের ব্লকটা ওকে কিনে দেওয়াটাই ভুল হয়েছে। এখন লেখাপড়া বাদ দিয়ে ক'দিন ধরে চলবে শুধু রোবট আর রোবট—।'

রণবীর শ্রেয়সীকে পালটা বললেন, 'যতদূর মনে পড়ছে, আমি তো এটা কিনে দেওয়ার এগেইনস্টেই ছিলাম। কিন্তু কে একজন যেন বুয়ানের হয়ে ওকালতি করেছিল...।'

শ্রেয়সী ছেলের বইপত্রের দিকে ইশারা করে বললেন, 'তখন তো আর জানি না, রোবটের নেশায় লেখাপড়া লাটে উঠবে! যাকগে, রাত দশটা বেজে গেছে, এখন খেতে চলো দেখি! বুয়ান, জুনো যেমন

আছে থাক, এখন চলো তো, খেতে চলো...।'

বুয়ান জুনোর রিমোটের 'স্টপ' বোতাম টিপে দিল। তারপর ওর কাছ থেকে উঠে পড়ল। তবে ঘর ছেড়ে বেরোনোর সময় দুবার ওর দিকে পিছন ফিরে তাকাল। যেন বলতে চাইল, 'তুমি টেবিলে দাঁড়িয়ে একটু রেস্ট নাও, আমি পাঁচমিনিট পরেই আসছি...।'

জুনোকে নিয়ে বুয়ান এমন মেতে উঠল যে, জুনো হয়ে গেল ওর 'বেস্ট ফ্রেন্ড'। তবে একইসঙ্গে ও পড়াশোনা শুরু করল মন দিয়ে। আর সত্যি-সত্যিই স্কুলের সামার ভ্যাকেশনের হোমটাস্ক রোজ নিয়ম করে করতে লাগল।

বুয়ানের পড়ার টেবিলের ডানদিকে আর-একটা টেবিল বসানো হয়েছে। সেই টেবিলটা জুনোর জন্য। জুনো সবসময় সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে, নয় চলাফেরা করে। ওকে পাশে রেখে বুয়ান পড়াশোনা করে। কখনও-কখনও ওর সঙ্গে কথা বলে, কিংবা 'টক' বোতাম টিপে জুনোর কথা চালু করে দেয়। ওর কথা শোনে, কখনও বা পালটা কথাও বলে, কিন্তু জুনো বুয়ানের কথা বুঝতে পারে না বলে ওর ভেতরের সেট করা প্রোগ্রাম অনুযায়ী নিজের কথা বলেই যায়।

জুনোর ব্যাপার নিয়ে ছেলের এই পাগলামিতে শ্রেয়সী বা রণবীর নাক গলাননি, বাধাও দেননি। বরং ওঁরা লক্ষ করেছিলেন, জুনো বাড়িতে আসার পর থেকে বুয়ানের লেখাপড়ার দিকে মনোযোগ অনেক বেড়ে গেছে। অনেক সময় ওঁদের মনে হয়েছে, বুয়ান যেন জুনোকে দেখিয়ে-দেখিয়ে ওর পড়াশোনার বহরটা অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে।

একদিন সন্ধেবেলা পড়াশোনার মাঝে ব্রেক নিয়ে জুনোর সঙ্গে খেলতে শুরু করল বুয়ান। 'টক' বোতাম টিপে ওর কথা চালু করে দিল। জুনো ওর প্রোগ্রাম অনুযায়ী বাঁধাধরা কথা বলতে লাগল।

'হাই, মাই নেম ইজ জুনো।' একটু জড়ানো ধাতব কণ্ঠস্বর। তবে কী বলছে সেটা স্পষ্ট বোঝা যায়।

বুয়ান জুনোর কথার জবাব দিল: 'আমার নাম বুয়ান। ভালো নাম অঙ্কুশ।'

'আই অ্যাম ইয়োর ফ্রেন্ড।'

'আমিও তোমার বন্ধু।'

'আই লাভ ইউ।'

'আমিও তোমাকে ভালোবাসি।'

'কাম, লেট আস প্লে।'

'হ্যাঁ, চলো—আমরা খেলি।'

তারপরই জুনো চুপ। কারণ, এই চারটি কথা শোনানোর ব্যবস্থাই করা আছে জুনোর সিস্টেমে। আর এক-একটা সংলাপ বলার পর জুনো চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ। সেই চুপ করে থাকার সময়টুকুতে বুয়ান ওর ইচ্ছেমতো উত্তর দেয়।

জুনো রোজ একইরকম কথা বারবার বলে, কিন্তু বুয়ানের সেটা মোটেই একঘেয়ে লাগে না। তা ছাড়া ওর বিশ্বাস, জুনো ওর সঙ্গে মিশে একদিন না একদিন নতুন-নতুন কথা বলতে শিখবে।

এই বিশ্বাসের কথা মা আর বাপিকেও জানিয়েছে বুয়ান। শুনে যা হওয়ার তাই হয়েছে: ওঁরা দুজনেই হেসে ফেলেছেন।

'তাই আবার কখনও হয় না কি? জুনো তো একটা মেশিন—মানুষ তো আর নয়!' বাপি।

'জুনো তোর সঙ্গে নতুন-নতুন কথা বলতে না পারুক, তুই তো পারিস! তুই ওর সঙ্গে মন খুলে গল্প কর—।' মা।

তো সেটাই করে বুয়ান। জুনোর সঙ্গে অনেক গল্প করে। ওকে স্কুলের নানান বন্ধুর কথা শোনায়, টিভিতে দেখা প্রোগ্রামের গল্প বলে, বলে টিনটিনের চাঁদে অভিযানের গল্প, ডাইনোসরের গল্প, মহাকাশের গল্প, আরও কত কী!

বুয়ানের এক-একসময় হঠাৎ করে মনে হয়, গল্প শুনতে-শুনতে জুনো মাথা নাড়ছে।

মাঝে-মাঝে ডাইনোসর আর মহাকাশের বই নিয়ে জুনোর সামনে বসে পড়ে বুয়ান। বইগুলো বড় মাপের, তাতে সুন্দর-সুন্দর রঙিন ছবি। সেইসব বই থেকে জুনোকে পড়ে-পড়ে শোনায়। জুনো সেসব বুঝতে না পারলেও কথা বলে যায়—ওর সেই পুরোনো কথা।

'হাই, মাই নেম ইজ জুনো।' 'আই অ্যাম ইয়োর ফ্রেন্ড।' ইত্যাদি।

যতই পুরোনো হোক কথাগুলো শুনতে ভালো লাগে বুয়ানের। তবে মাঝে-মাঝে মনে হয়, ইস, জুনো যদি নতুন-নতুন কথা বলতে পারত!

একদিন সন্ধেবেলা একটা অদ্ভুত ব্যাপার হল।

তখন ঘড়িতে ক'টা বাজে? সাতটা কি সওয়া সাতটা। আধঘণ্টা ধরে বাইরে প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি শুরু হয়েছে। মাঝে-মাঝেই আকাশ আলোয় ভাসিয়ে ঝলসে উঠছে বিদ্যুৎ, আর তার পরেই কড়-কড়-কড় কড়াৎ। কানফাটানো আওয়াজে কেঁপে উঠছে বাড়ি।

বাজ পড়ার ব্যাপারটাকে শ্রেয়সী ভীষণ ভয় পান। তাই বাজের প্রতিটি আওয়াজের পরপরই তিনি ভয়ে তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠছেন এবং সেই চিৎকার থামানোর জন্য রণবীর বারবার বলছেন, 'কী হচ্ছে, শ্রেয়সী! কেন এমনি করে বাচ্চাদের মতো চিৎকার করছ!'

বুয়ান তখন জানলা-টানলা বন্ধ করে পড়াশোনা করছিল। পাশের টেবিলে জুনো হেঁটে বেড়াচ্ছিল, কথা বলছিল। বুয়ান বাজ পড়ার শব্দকে মোটেই ভয় পায় না। কিন্তু বাজ-টাজ পড়লে মায়ের এই ছেলেমানুষি কাণ্ড দেখতে ওর খুব মজা লাগে। তাই ও পড়া ফেলে ছুটল মায়ের কাণ্ড দেখতে। এবং সেই কাণ্ড দেখে ও তো হেসেই কুটিপাটি। ও আর বাপি মা-কে বাজ পড়ার ভয় দেখিয়ে মজা করতে লাগল।

একটু পরেই বুয়ান চলে এল ওর পড়ার ঘরে। ঝড়-বৃষ্টির দাপট তখন আরও বেড়েছে। জুনো টেবিলের ওপরে ওর নিজের মতো হেঁটে বেড়াচ্ছিল।

হঠাৎই ঝোড়ো হাওয়ার দাপটে ঘরের একটা জানলা খুলে গেল। সোঁ-সোঁ হাওয়া ঢুকে পড়ল ঘরে। সেইসঙ্গে বৃষ্টির ছাট। বিকট শব্দে বাজ পড়ল কাছেই। এবং জুনো উলটে পড়ে গেল টেবিলের ওপরে।

বুয়ান প্রায় দৌড়ে গেল টেবিলের কাছে—জুনোকে সোজা করে দাঁড় করাতে গেল। কিন্তু ওকে অবাক করে দিয়ে জুনো নিজেই সোজা হয়ে দাঁড়াল, চলতে শুরু করল আগের মতো।

ব্যাপারটা কী হল?

বুয়ান হাঁ করে তাকিয়ে রইল আট ইঞ্চি মাপের রোবটটার দিকে। ওটা যে পড়ে গেলে আবার নিজে-নিজেই উঠে দাঁড়াতে পারে এমন কথা দোকানের সেলসম্যান ছেলেটিও বলেনি, আর ম্যানুয়াল পড়ে বাপিও কিছু বলেননি। তা হলে?

বুয়ান ওর পড়ার টেবিলে বসে পড়ল। রিমোটটা রাখা ছিল কম্পোজিট ম্যাথ বইটার পাশেই—সেটা তুলে নিয়ে বোতাম টিপে জুনোকে থামাল। তারপর 'রোটেট' বোতাম টিপে জুনোকে ঘুরিয়ে নিজের দিকে মুখ করিয়ে দাঁড় করাল। ওর শরীরের এল. ই. ডি. বাতিগুলো দপদপ করে জ্বলছে নিভছে।

'ব্যাপার কী, জুনো? তুমি পড়ে গেলে নিজে-নিজে উঠে দাঁড়াতে পারো?'

'পারি—' পরিষ্কার বাংলায় জবাব দিল বুয়ানের রোবট, 'এটা সিক্রেট। আর কেউ যেন জানতে না পারে। তুমি আমার বেস্ট ফ্রেন্ড।'

বুয়ান কিছুক্ষণ কোনও কথা বলতে পারল না। জুনো এরকম পালটে গেল কী করে! ওর 'টেল মি হোয়াই' সিরিজের বই পড়ে ও জেনেছে, বাজ পড়া মানে হাই ভোল্টেজ ইলেকট্রিসিটির ডিসচার্জ। সেই সময়

কাছাকাছি কোনও ধাতুর জিনিস থাকলে তার মধ্যে ভোল্টেজ তৈরি হয়—ইনডিউসড ভোল্টেজ। সেরকম কিছু হয়েই কি জুনো পালটে গেল? ওর ভেতরের প্রোগ্রামের বাইরে কাজ করতে লাগল? হিসেবের বাইরে কথা বলতে লাগল?

বুয়ানকে চমকে দিয়ে জুনোর এই পালটে যাওয়ায় সবচেয়ে বেশি খুশি হল বুয়ান। কিন্তু ব্যাপারটা সিক্রেট রাখতে হবে। ওর বেস্ট ফ্রেন্ড ওকে সে-কথাই বলেছে।

এরপর থেকে বুয়ানের দিন আর রাত কেমন পালটে গেল। জুনোর সঙ্গে ওর 'সিক্রেট বন্ধুত্ব' ক্রমশই বাড়তে লাগল। রণবীর আর শ্রেয়সী সেই আড়ালের বন্ধুত্বের কথা মোটেও জানতে পারলেন না।

বুয়ান যতক্ষণ বাড়িতে থাকে ততক্ষণ জুনো ওর সঙ্গে-সঙ্গে থাকে। এমনকী খাওয়ার টেবিলে যখন বুয়ান খেতে বসে তখনও জুনোকে ওর চেয়ারের পাশে মেঝেতে দাঁড় করিয়ে রাখে। এ ছাড়া টিভি দেখা, কমিকস কিংবা গল্পের বই পড়ার সময়, অথবা পড়াশোনার সময় জুনো তো পাশে আছেই!

প্রথম-প্রথম ছেলের এই 'জুনো ম্যানিয়া' নিয়ে শ্রেয়সী এবং রণবীর বুয়ানের সঙ্গে অনেক চেঁচামেচি করেছেন। কিন্তু বুয়ান বারবারই বলেছে, 'জুনো আমার পড়াশোনায় কত হেলপ করে জানো?'

'একটা মেকানিক্যাল রোবট—সেটা আবার হেলপ করবে কী করে!' শ্রেয়সী একইসঙ্গে অবাক এবং বিরক্ত।

বুয়ান হেসে বলেছে, 'ও তোমরা বুঝবে না, মা—ওটা আমাদের দুজনের সিক্রেট...।'

রণবীর ধৈর্য হারিয়ে বলেন, 'কী যে সব এলোমেলো কথা বলিস...!'

এইরকম ক'দিন ঝামেলা চলার পর বুয়ানের ক্লাস টেস্টের রেজাল্ট বেরোতে শুরু করল। এবং তখনই শ্রেয়সী আর রণবীর চুপ করে যেতে বাধ্য হলেন। কারণ, বুয়ান দারুণ সব নম্বর পেয়েছে। সব ক'টা এগজ্যামেই গ্রেড 'ও'—আউটস্ট্যান্ডিং। এর আগে ও কখনও এত ভালো স্কোর করতে পারেনি। সুতরাং, বুয়ানকে তখন আর পায় কে!

সত্যিই জুনো ওকে অনেক হেলপ করে। জুনো অনেক বিষয়ে অনেক কিছু জানে। ওর সামনে বুয়ান এ পর্যন্ত যত পড়াশোনা করেছে তার সবটুকুই জুনোর মগজ ব্লটিং পেপারের মতো শুষে নিয়েছে। যখন-তখন ও বুয়ানের পড়ার ভুল শুধরে দেয়। এ ছাড়া নতুন অনেক কিছু শিখিয়ে দেয় ওকে। রণবীর আর শ্রেয়সী যখন কাছে থাকেন না তখনই ওদের দুজনের মধ্যে এইসব কথাবার্তা হয়। আর যদি ওঁদের দুজনের কেউ একজন কাছে থাকেন তা হলে জুনোর ছক বাঁধা 'হাই, মাই নেম ইজ জুনো।' শুরু হয়ে যায়।

একদিন সন্ধেবেলা বুয়ান একটা বই পড়ছিল। বেশ বড় মাপের বাঁধানো বই। তাতে অনেক রঙিন ছবি। বইটার নাম 'মাই বিগ এনসাইক্লোপিডিয়া অফ ডাইনোসরস'।

বুয়ান পড়ছিল আর অবাক হয়ে ডাইনোসর যুগের হরেকরকম প্রাণীর ছবি দেখছিল।

জুনো বইটার আশপাশ দিয়ে ঘোরাফেরা করছিল। বুয়ানের পড়া শুনে ও ধাতব গলায় বলে উঠল, 'এটা মেসোজোয়িক যুগের ব্যাপার। এই যুগের টাইম লেংথ হচ্ছে একশো বিরাশি মিলিয়ন বছর। এই সময়ের মধ্যে রয়েছে তিন-তিনটে পিরিয়ড: ট্রায়াসিক পিরিয়ড, জুরাসিক পিরিয়ড আর ক্রিটেইশাস পিরিয়ড। ট্রায়াসিক পিরিয়ডে ছোট-ছোট ডাইনোসরের জন্ম হয়। জুরাসিক পিরিয়ডে ওরা সংখ্যায় আর মাপে বেড়ে ওঠে। সবচেয়ে বড় তৃণভোজী ডাইনোসর ছিল অ্যাপাটোসরাস, আর সবচেয়ে বড় মাংসাশী ডাইনোসর ছিল টিরানোসরাস রেক্স। তারপর ক্রিটেইশাস পিরিয়ডে ওদের মাপ আর দাপট আরও বাড়তে থাকে। বাড়তে-বাড়তে হঠাৎই সব শেষ। সায়েন্টিস্টদের আইডিয়া হল, একটা প্রকাণ্ড ধূমকেতু এসে আছড়ে পড়েছিল পৃথিবীর বুকে। আর সেই মহা সংঘর্ষেই ডাইনোসররা একদম খতম। এই অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছিল প্রায় পঁয়ষট্টি মিলিয়ন বছর আগে...।'

জুনোর কথা শুনতে-শুনতে অবাক হয়ে যাচ্ছিল বুয়ান। কারণ, রোবটটা এমন অনেক কথা বলছে যেগুলো বইটাতেও লেখা নেই!

বুয়ানের কী মনে হল, ও বই বন্ধ করে উঠে পড়ল। বলল, 'জুনো, জাস্ট এক মিনিট ওয়েট করো। আমার টিরানোসরাস রেক্সের একটা ব্লক আছে। ওটা কিছুদিন আগে আমি তৈরি করেছিলাম। এক্ষুনি নিয়ে আসছি। ওই ডাইনোসরটা দেখলে তুমি অবাক হয়ে যাবে...।'

বুয়ান ছুটে চলে গেল শোওয়ার ঘরে। সেই ঘরের এক কোণে ওর খেলনার পাহাড়। ক্লাস ফাইভে পড়ে অথচ এখনও ও ছোট বাচ্চার মতো খেলনা নিয়ে খেলতে ভালোবাসে।

আধ মিনিটের মধ্যেই টিরানোসরাস রেক্সকে হাতে নিয়ে ফিরে এল ও। ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে চলে এল জুনোর কাছে।

'এই দ্যাখো, জুনো, কী সুন্দর দেখতে। টিরানোসরাস রেক্স...।'

প্রাণীটা দেখতে বড় ভয়ংকর, হিংস্র। অসংখ্য তীক্ষ্ণ ধারালো দাঁত। সবুজ, কালো আর বাদামি রং। গা-টা চকচক করছে, আলো পিছলে যাচ্ছে এমনভাবে যে, মনে হচ্ছে সারা গায়ে লালা মাখানো। একটা প্রকাণ্ড টিকটিকি যেন দু-পায়ে দাঁড়িয়ে আছে। সামনের দুটো পা ছোট, মাথাটা বড়। মুখটা হাঁ করা।

এই প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীটাকেই ছোট-ছোট পলিমারের ব্লক জুড়ে-জুড়ে বুয়ান তৈরি করেছে। মাপে ছোট একটা মডেল হলেও প্রাণীটা একেবারে যেন জীবন্ত।

'অ্যানিম্যালটা দারুণ ইন্টারেস্টিং দেখতে...।' জুনো বলল।

বুয়ানের মাথায় এক অদ্ভুত খেয়াল চাপল। আচ্ছা, ডাইনোসরের দেশে অ্যাডভেঞ্চার করতে গেলে কেমন হয়? ওঃ, একটা সুপার-ডুপার অ্যাডভেঞ্চার হবে তা হলে!

সেই কথাটাই জুনোকে জিগ্যেস করল বুয়ান।

জুনো ওর ধাতব গলায় উত্তর দিল, 'সেটা পসিবল নয়, ফ্রেন্ড। কারণ, ডাইনোসরদের ল্যান্ডে যেতে হলে আমাদের টাইম ট্র্যাভেল করতে হবে। আর টাইম ট্র্যাভেল করতে হলে টাইম মেশিন চাই। ব্যাড লাক, আমাদের কোনও টাইম মেশিন নেই।'

শুনে মুখ ব্যাজার করল বুয়ান। ওঃ, একটা মেশিনের জন্য একটা অ্যাডভেঞ্চার ফসকে গেল!

এমন সময় দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকলেন শ্রেয়সী।

'বুয়ান, তোর রুটিন ধরে স্কুলের ব্যাগ গোছানো হয়ে গেছে? নাকি কাল স্কুল আছে সেটা ভুলে গেছিস!'

বুয়ান সঙ্গে-সঙ্গে ডাইনোসরের বই বন্ধ করে উঠে পড়ল, বলল, 'এই দ্যাখো না, এক মিনিটে গুছিয়ে নিচ্ছি...।'

জুনো ওর প্রোগ্রাম বাঁধা সংলাপ শুরু করে দিল।

'হাই, মাই নেম ইজ জুনো।'

আবার নতুন দুটো ব্লক কিনল বুয়ান। একটা অ্যাপাটোসরাস, আর-একটা চাঁদ। ওর পড়াশোনা ভালো হচ্ছে, পরীক্ষাতেও ভালো-ভালো নম্বর পাচ্ছে, তাই শ্রেয়সী বা রণবীর ছেলের নতুন বায়না মেটাতে আর আপত্তি করেননি।

সুতরাং নতুন ব্লক দুটো নিয়ে এবার মেতে উঠল বুয়ান। পরের দিনই তৈরি হয়ে গেল দুটো জিনিস: তৃণভোজী ডাইনোসর আর চাঁদ। মা আর বাপি আশেপাশে না থাকলেই নতুন ব্লক নিয়ে জুনোর সঙ্গে ওর গল্প চলতে লাগল।

অ্যাপাটোসরাসটা মাপে ইঞ্চিসাতেক একটা মডেল হলেও দেখতে একেবারে জীবন্ত। ঠিক ওর টিরানোসরাস রেক্সের মতন।

চাঁদটাও ঠিক যেন তাই। মাপে দশ ইঞ্চি ব্যাসের একটা ফুটবলের মতো হলেও দেখতে হুবহু আসল চাঁদের মতো। ক্ষতচিহ্নের মতো দেখতে উল্কাপাতের বড়-বড় গর্ত, সাদা বিস্তীর্ণ অঞ্চলের ওপরে কালো-

কালো শিরা-উপশিরা—পরিভাষায় যাকে বলে 'লুনার মারিয়া'। এ ছাড়া 'ইমপ্যাক্ট বেসিন', 'ক্রেটার'—বইয়ে যা-যা পড়েছে বুয়ান তার সবকিছুরই ইশারা রয়েছে চাঁদের এই খুদে মডেলে।

আরও একটা অদ্ভুত জিনিস লক্ষ করল বুয়ান। অন্ধকারে চাঁদের মডেলটা থেকে হালকা আলোর আভা বেরোয়। হয়তো চাঁদ তৈরির ছোট-ছোট ব্লকগুলো ফ্লুওরেসেন্ট পলিমার দিয়ে তৈরি।

একদিন সন্ধের পর পড়াশোনার পাট চুকিয়ে জুনোর সঙ্গে খেলতে শুরু করল। খেলার সরঞ্জাম হিসেবে হাতের কাছে রয়েছে একজোড়া ডাইনোসর আর চাঁদ।

বুয়ান আর জুনো নিজেদের মধ্যে নানান কথা বলছিল। তারই মধ্যে বুয়ান হঠাৎ বলে উঠল, 'জুনো, চলো, আমরা চাঁদে যাই—।'

'যাব বললেই যাওয়া যায়! একটা স্পেসশিপ লাগবে, আর তোমার জন্যে লাগবে স্পেস-স্যুট—নইলে তুমি চাঁদে নামবে কী করে!'

'আর তুমি? তোমার স্পেস-স্যুট লাগবে না?'

'না। বিকজ আমি তো রোবট—স্পেশাল প্লাস্টিক আর মেটাল দিয়ে তৈরি...।'

বুয়ান বুঝতে পারল, ওর বেস্ট ফ্রেন্ড ওর সঙ্গে মজা করছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও স্পেসশিপ আর স্পেস-স্যুটের ব্যাপারটা ওর মাথায় গেঁথে গেল। ব্লকের দোকানে ও এই ব্লকগুলো বিক্রি হতে দেখেছে। সুতরাং সেগুলোর না হয় ব্যবস্থা হল। কিন্তু...।

'কিন্তু জুনো, চাঁদ তো মহাকাশে ভেসে থাকে! আমার এই চাঁদটা, তুমি তো জানো, মেঝেতে থাকে—গড়ায়...।'

'সব জানি। চিন্তা কোরো না—ধীরে-ধীরে সব হবে। চাঁদের অ্যাটমসফিয়ার তৈরি করতে হবে, চাঁদের গ্র্যাভিটি তৈরি করতে হবে, ওটাকে শূন্যে ভাসাতে হবে—তবেই না ব্লকের মডেলটা আসলের মতো হবে!'

জুনোর কথায় বুয়ানের হাসি পেয়ে গেল। কী যে আজেবাজে বকছে রোবটটা! বুয়ান জানে, চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের ছ'ভাগের একভাগ। সেইজন্যই চাঁদে বায়ুমণ্ডল খুব পাতলা—প্রায় নেই বললেই চলে।

কিন্তু কী করে এসব তৈরি করবে জুনো?

সে যাই হোক, সপ্তাহখানেকের মধ্যে স্পেসশিপ আর স্পেস-স্যুটের ব্লক চলে এল বাড়িতে এবং দু-দিনের মধ্যে মডেল দুটো তৈরিও হয়ে গেল।

তারপর চাঁদে যাওয়া নিয়ে দু-বন্ধুর চর্চা চলতে লাগল দিনের পর দিন।

চাঁদ সম্পর্কে বুয়ান অনেক কথা জানে। কিন্তু জুনোর কথায় ও বুঝতে পারল, চাঁদ সম্পর্কে জুনোর জ্ঞান বুয়ানের অন্তত একশো গুণ। ও জানে, চাঁদের ব্যাস ১৭৩৮ কিলোমিটার, চাঁদ পৃথিবীকে ঘিরে পাক খাওয়ার সময় চাঁদের একটা পিঠ সবসময় পৃথিবীর দিকে 'মুখ' করে থাকে, চাঁদের কালচে এলাকাগুলোর নাম 'মারিয়া', আর আলোকিত অঞ্চলগুলো 'লুনার হাইল্যান্ডস'। এও জানে, পৃথিবী থেকে চাঁদের গড় দূরত্ব ৩৮৪৪০০ কিলোমিটার।

বুয়ান বলল, 'জানো, ১৯৬৯ সালের ২০ জুলাই নিল আর্মস্ট্রং প্রথম চাঁদের মাটিতে পা রেখেছিলেন? ওঁর সঙ্গী ছিলেন এডুইন অলড্রিন?'

'জানি।' বলল জুনো, 'ওঁদের আর-এক সঙ্গী মাইকেল কলিন্স লুনার মডিউলের ভেতরে বসেছিলেন...চাঁদে নামেননি...।'

চাঁদে যাওয়ার জন্য বুয়ানের আর তর সইছিল না। ও তাগাদা করে-করে জুনোকে একেবারে পাগল করে দিচ্ছিল। তাতে বেস্ট ফ্রেন্ড সবসময় বলে, 'একটু সবুর করো। ঠিক সময় এলেই আমরা স্টার্ট দেব...।' একটু থেমে জুনো আবার বলেছে, 'জানো তো, চাঁদের টেম্পারেচার ওর নানান জায়গায় নানান রকম। -১৮০ ডিগ্রি

সেলসিয়াস থেকে +১১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত ওঠা-নামা করে। আমরা ওর এমন জায়গায় গিয়ে ল্যান্ড করব যেখানে টেম্পারেচার আটাশ কি তিরিশ ডিগ্রি—মানে, আমাদের পক্ষে খুব কমফোর্টেবল, বুঝলে?'

বুয়ান শোনে, কিন্তু ওর মনে হয় পুরো ব্যাপারটাই মিথ্যে, মনভোলানো কথা। কিন্তু তার পরের মুহূর্তেই মনে হয়, জুনো ওর বেস্ট ফ্রেন্ড। বেস্ট ফ্রেন্ড কখনও মিথ্যে কথা বলবে না!

চারদিন পরেই এসে গেল সেই দিন।

রাত আটটার সময় পড়ার ঘরের দরজা ভেজিয়ে জুনোর কাছে এসে বসল বুয়ান। হাতের কাছেই রাখা আছে স্পেস-স্যুট, স্পেসশিপ আর চাঁদ। এইবার জুনো শুরু করবে ওদের চাঁদে পাড়ি দেওয়ার তোড়জোড়।

এবং শুরু হয়েও গেল।

জুনো বলল, 'বুয়ান, এখন আমি যা-যা করব সেটাকে তুমি মোটেই ম্যাজিক বলে ভেবো না। কারণ, বিজ্ঞান আর প্রযুক্তি যখন অনেকটা এগিয়ে যায় তখন সেটাকে সবাই ম্যাজিক ভেবে ভুল করে। এসো, লেট আস স্টার্ট...ওয়ান, টু, থ্রি...।'

ঘরের ভেজানো দরজা ঠেলে খুলতেই যে-দৃশ্য শ্রেয়সীর চোখে পড়ল সেরকম দৃশ্য বুঝি শুধু স্বপ্নেই দেখা যায়।

বুয়ানকে ডাকতে এসেছিলেন শ্রেয়সী। কিন্তু দরজা খুলতেই পাথর হয়ে গেলেন।

কোথায় বুয়ান!

তার বদলে চোখের সামনে এক ম্যাজিক-দৃশ্য।

ঘরটা অন্ধকার। তবে একটা হালকা আলোর নীল আভা ছড়িয়ে রয়েছে ঘরে। ঘরটা এত ঠান্ডা যেন মনে হচ্ছে ঘোর শীতকাল। ঘরের ঠিক মাঝখানে শূন্যে ভেসে রয়েছে একটা সাদা গোলক—ব্লক দিয়ে তৈরি বুয়ানের চাঁদ। সেই চাঁদের গায়ে আসল চাঁদের মতো কলঙ্কের দাগ চোখে পড়ছে।

গোলকটা যে শুধু ভেসে রয়েছে তা নয়। খুব ধীরে-ধীরে একটা বৃত্তাকার কক্ষপথে পাক খাচ্ছে। আর সেই গোলকের ওপর লাফালাফি করে খেলা করছে দুটো ছোট-ছোট পুতুল: একটা প্লাস্টিক আর মেটালের তৈরি রংচঙে রোবট—তার সারা শরীরে এখানে-সেখানে রঙিন ফুটকির মতো ছোট-ছোট বাতি জ্বলছে; আর দ্বিতীয় পুতুলটার শরীরে মহাকাশচারীদের স্পেস-স্যুট।

পুতুল দুটোর লাফের ধরন ভারী অদ্ভুত। ওরা ধীরে-ধীরে ভেসে উঠছে শূন্যে, আবার ধীরে-ধীরে নেমে আসছে গোলকের পিঠে। ঠিক যেন স্লো-মোশনে বাস্কেট বল খেলায় গোল করছে। আর এত লাফালাফি সত্ত্বেও, আশ্চর্য, পুতুল দুটো গোলকের ওপর থেকে পড়ে যাচ্ছে না!

পুতুল দুটোর কাছ থেকে বেশ খানিকটা তফাতে 'মিনি' চাঁদের পিঠে ওপরদিকে মুখ উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা খুদে স্পেসশিপ—দেখে অন্তত তাই মনে হল শ্রেয়সীর। কেমন একটা ঘোরের মধ্যে অস্ফুটে 'বুয়ান!' বলে একবার ডেকে উঠলেন। একইসঙ্গে মাথাটা টলে উঠল।

তারপর আর কিছু মনে নেই।

তিন নম্বর কোণ

স্বর্ণার ভয়ংকর ফোনটা যখন এল তখন দুপুর দুটো মতন হবে। আমি রোজকার মতো অফিসে—এইচ. আর. ডিপার্টমেন্টের ম্যানেজার তুষার পারেখের চেম্বারে বসে কথা বলছি। নেক্সট মাসের শুরুতে একটা ইন্টারভিউ অ্যারেঞ্জ করতে হবে—সেটা নিয়েই পারেখের সঙ্গে 'কবির লড়াই' চলছিল। পারেখ যে-কোনও ইস্যুতেই আরগিউ করে। তাই অফিসে ওর নিকনেম আরগিউমেন্ট পারেখ।

ওর সঙ্গে কথা বলতে-বলতে পকেটের মোবাইল বেজে উঠেছিল। ফোন বের করে দেখি স্ক্রিনে স্বর্ণার নাম।

পারেখের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'এক্সকিউজ মি—ওয়াইফ। কলটা নিচ্ছি—।'

কল অ্যাকসেপ্ট করে 'হ্যালো' বলামাত্রই ও-প্রান্ত থেকে স্বর্ণমালার ভয় পাওয়া চিৎকার শোনা গেল।

আমি পাথর হয়ে গেলাম।

'রীতেশ! রীতেশ! হেলপ! বাঁচাও! বাড়িতে একটা লোক ঢুকে পড়েছে! শিগগির এসো—!'

ওর কথা মাঝপথেই আচমকা থেমে গেল।

আমি কয়েক সেকেন্ড হতভম্ব হয়ে বসে রইলাম। মাথাটা পুরো ব্ল্যাঙ্ক হয়ে গিয়েছিল। তারপরই ইলেকট্রিক শক খাওয়া পাবলিকের মতো ছিটকে উঠে দাঁড়ালাম।

পারেখ বড়-বড় চোখ করে আমার দিকে তাকাল: 'কী হয়েছে, মজুমদার?'

'হরিবল ক্রাইসিস। আমাকে এক্ষুনি বাড়ি যেতে হবে—।'

পারেখ পুলিশে খবর দেওয়ার কথা বলছিল, কিন্তু ততক্ষণে আমি ওর চেম্বারকে পাঁচ হাত পেছনে ফেলে এসেছি।

আমার বুকের ভেতরে বিগ ড্রাম বাজছিল: ডুম-ডুম-ডুম। সেই অবস্থাতেই ছুটে চললাম লিফটের দিকে। ফ্লোরের দু-তিনজন কলিগ যে আমাকে অবাক চোখে দেখছে সেটা চোখের কোণ দিয়ে স্পষ্ট টের পেলাম।

একতলায় নেমে আবার ছুট রাস্তার দিকে।

একটা ট্যাক্সিকে বাড়তি ভাড়া কবুল করে কোনওরকমে রাজি করালাম। তারপর সোজা বাড়ির দিকে।

ফেরার পথে অন্তত দশবার স্বর্ণার ফোনে ফোন করলাম। কোনও সাড়া নেই। সুইচড অফ।

আধঘণ্টা কি পঁয়ত্রিশ মিনিট পর বাড়িতে পৌঁছে গেলাম।

সদর দরজার কাছে গিয়ে দেখি দরজা বন্ধ। কাঁপা হাতে পকেট থেকে চাবি বের করে দরজা খুললাম। সামনেই ড্রয়িং-ডাইনিং স্পেসের অনেকটা চোখে পড়ছে। সেখানে কেউ নেই। থাকার কথাও নয়। স্বর্ণমালার এখন ভেতরের বেডরুমে ঘুমিয়ে থাকার কথা। কিন্তু ফোনের ওই এস. ও. এস. টাইপের চিৎকার...।

কান পেতে যে-কোনওরকম শব্দ শোনার চেষ্টা করলাম। না, কোনও শব্দ নেই। সব চুপচাপ।

সদর দরজা বন্ধ করে দিলাম।

স্বর্ণা ছাড়া বাড়িতে কি আর কেউ আছে?

উদভ্রান্তের মতো এ-ঘর সে-ঘর খুঁজে বেড়ালাম।

না, স্বর্ণা কোথাও নেই! কোথায় গেল ও?

এরপর বাকি রইল শুধু দোতলা—মানে, ছাদে যাওয়ার সিঁড়ি আর ছাদ।

দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করলাম।

ছ'-সাতটা ধাপ উঠতে না উঠতেই স্বর্ণমালার মোবাইলের দেখা পেলাম। ভেঙে চুরচুর। ভারী কিছু দিয়ে হ্যান্ডসেটটাকে কেউ প্রবল আক্রোশে থেঁতো করেছে। সেইজন্যেই ওর ফোনে আট-দশবার ফোন করে ফোন সুইচড অফ পেয়েছি।

মোবাইল ফোনের পর স্বর্ণমালাকে দেখতে পেলাম। আরও তিন-চার ধাপ ওপরে চিৎ হয়ে পড়ে আছে। পা দুটো ছাদের দরজার দিকে, মাথা নীচের দিকে। বাদামি আর কালোয় ছাপা ম্যাক্সিটা অনেকটা নেমে এসে মিনিস্কার্ট হয়ে গেছে।

স্বর্ণমালার মাথাটা একেবারে রক্তারক্তি ব্যাপার। খুনি মোবাইল ফোনটার ওপরে নেট প্র্যাকটিস করার পর স্বর্ণার মাথাটা নিয়ে যেন প্রবল আক্রোশে ছক্কা হাঁকিয়েছে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে, স্বর্ণা আর বেঁচে নেই। তবুও ছড়িয়ে থাকা ডানহাতের কবজি টিপে পালস চেক করলাম। কোনও দপদপানি নেই। স্বর্ণা আর নেই।

আমার মুখ দিয়ে একটা চাপা চিৎকার বেরিয়ে এল। একইসঙ্গে মাথাটা কেমন টলে উঠল। সিঁড়িতে বসে পড়লাম। তারপর আর কিছু মনে নেই।

যখন জ্ঞান ফিরল তখন দেখি আমি সিঁড়ির রেলিঙে হেলান দিয়ে অলসভাবে বসে আছি। স্বর্ণমালা ঠিক একইভাবে পড়ে রয়েছে। ওর মুখের ওপরে মাছি বসছে।

আমি কতক্ষণ অজ্ঞান হয়ে ছিলাম কে জানে! একটা ভয়ের ঢেউ আছড়ে পড়ল মাথায়। তারপরেই এল শোকের প্লাবন।

স্বর্ণা আর নেই! ওকে যে আমি পাগলের মতো ভালোবাসতাম! স্বর্ণা! স্বর্ণা!

আমার কান্নাটা বোধহয় বুকের ভেতরে দলা পাকিয়ে গিয়েছিল। কারণ, আমার শরীরটা থরথর করে কাঁপলেও মুখ দিয়ে কোনও আওয়াজ বের করতে পারছিলাম না। খুব কাছের একজন ভালোবাসার মানুষকে আচমকা হারালে অবস্থাটা বোধহয় এরকমই হয়।

আমি রেলিং ধরে কোনওরকমে উঠে দাঁড়ালাম। এখন বসে থাকলে চলবে না। প্রথমে গোটা বাড়িটা ভালো করে একবার খুঁজে দেখা দরকার। কে জানে, মার্ডারার হয়তো এখনও পালাতে পারেনি। হয়তো বাড়ির ভেতরেই কোথাও ঘাপটি মেরে লুকিয়ে রয়েছে।

শরীরের কাঁপুনিটা থিতিয়ে আসছিল। তার বদলে জায়গা করে নিচ্ছিল রাগ, রাগ এবং রাগ। টের পাইনি, কখন যেন মাথার ভেতরে আগুন জ্বলতে শুরু করেছে।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলাম। সতর্ক চোখে এপাশ-ওপাশ দেখতে লাগলাম।

ড্রয়িং-ডাইনিং স্পেসে কালার টিভির পাশে একটা সুন্দর ছোট্ট টেবিল। তার গায়ে বাটালির আলপনা। সেই শৌখিন টেবিলটার ওপরে বসানো একটা বড়সড় পেতলের ফুলদানি। ফুলদানিতে অনেকগুলো রঙিন ফুল। নকল।

চট করে এগিয়ে গেলাম ফুলদানিটার কাছে। রঙিন ফুলগুলো বের করে টেবিলে রেখে দিলাম। তারপর ফুলদানিটা ডানহাতে মুগুরের মতো বাগিয়ে ধরলাম।

টের পেলাম, ফুলদানিটা যথেষ্ট ভারী এবং অস্ত্র হিসেবে মারাত্মক। কিন্তু আমার নার্ভের যা দশা তাতে দরকারি মুহূর্তে আমি কি ওটা ঠিকঠাক ব্যবহার করতে পারব?

ওটা হাতে নিয়ে সতর্ক পা ফেলে গোটা বাড়িটা ট্যুর করে ফেললাম। খোঁজাখুঁজির সময় খাটের তলা বা আলমারির পেছনও বাদ দিলাম না।

কিন্তু কোথাও কেউ নেই।

তবে দুটো ব্যাপার লক্ষ করলাম। কিন্তু সেদিকে আমি আগে মন দিইনি। কারণ, স্বর্ণার খোঁজে আমি পাগল ছিলাম। আর...তারপর...ওর খুনির খোঁজে।

প্রথম ব্যাপারটা হল, আমাদের বেডরুমের আলমারিটা হাট করে খোলা। তার কয়েকটা তাকের জিনিসপত্র বেশ ওলটপালট। কাছে গিয়ে চেক করতেই বুঝতে পারলাম ক্যাশ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা আর একটা সোনার চেন উধাও।

টাকাটা পরশুদিন আমরা ব্যাঙ্ক থেকে তুলে এনেছিলাম। প্ল্যান ছিল, আজ-কালের মধ্যেই আমরা একটা উঁচু মডেলের অটোমেটিক ওয়াশিং মেশিন কিনব। কারণ, কাচাকাচির পরিশ্রম আর মেসি ব্যাপারটা স্বর্ণমালা একেবারেই পছন্দ করত না।

বাকি রইল সোনার চেন। ওটা স্বর্ণা সবসময় গলায় পরত, আর মাঝে-মাঝেই খেয়ালখুশি মতো ওটা গলা থেকে খুলে আলমারির বুকসমান তাকটায় ফেলে রাখত।

আলমারিটায় চাবি দেওয়ার জন্যে বহুবার ওকে বলেছি, কিন্তু স্বর্ণা সে-পরামর্শ কখনও কানে তোলেনি। বরং হেসে বলেছে, 'আলমারির দরজায় চাবি দিয়ে কোনও ফ্যামিলি কখনও চোর-ডাকাতের হাত থেকে রেহাই পেয়েছে?'

কথাটা সাড়ে ষোলো আনা ঠিক।

আমি ফুলদানিটা মুঠোয় ধরে আলমারির সামনে পাঁচ-দশ সেকেন্ড ভ্যাবলার মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। স্বর্ণা চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে উঠল। আমার চোখে আবার জল এসে গেল।

নিজেকে সামলে নিয়ে রান্নাঘরের দিকে এগোলাম।

রান্নাঘরের সব বাসনপত্র মেঝেতে ছড়ানো। ঠিকমতো পা রাখার জায়গা নেই। আর মেঝেটা ভিজে। কোণের একটা কল অল্প খোলা। ক্যাবিনেটের তাকে কাপ-প্লেট সাজানো থাকলেও সেগুলো খুনি ভাঙচুর করেনি।

এটাই দ্বিতীয় ব্যাপার।

খুনি কেন এমন পাগলামো করেছে জানি না। তবে যাকগে, ওসব পাগলামোর কারণ-টারণ পুলিশ খুঁজে বের করবে। সেইসঙ্গে খুনিকেও।

ফুলদানিটা জায়গা মতো রেখে দিয়ে বাড়ির সদর দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলাম। পুলিশ—পুলিশে খবর দিতে হবে। পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করলাম। লোকাল থানার নম্বর কত? আমি তো জানি না। তা হলে কি ১০০ ডায়াল করব? সেই ফোনটা কোথায় লাগে? লালবাজারে?

আমি কনফিউজড অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ।

আমার বাড়ির সামনেটায় একটুকরো ফাঁকা জমি। সেখানে তিন-চারটে ফুলগাছ। স্বর্ণাই ওদের যত্ন করত। ওদের খারাপ দিন শুরু হল এখন থেকে। সেই সঙ্গে আমারও।

আমাদের বাড়ির লাগোয়া ব্যানার্জিদের দোতলা বাড়ি। রণেন ব্যানার্জি আর মিনতি ব্যানার্জি—দুই বুড়ো-বুড়ি। ওঁদের একটাই ছেলে—সায়ন। বিয়ে-টিয়ে করেনি। বিন্দাস আছে। 'ম্যাগনাম' নামের একটা এম. এন. সি.-তে চাকরি করে।

রণেন ব্যানার্জি দিন-রাত দাবা খেলেন—একা-একাই। কখনও-কখনও আমাকে ডাকাডাকি করেন। আমি বহুবার ওঁর কাছে দাবায় হেরেছি। হারতে যে আমার খারাপ লাগে তা নয়। তবে হেরে যাওয়ার পরই রণেনবাবু আমাকে দাবা খেলার বিষয়ে আধঘণ্টা কি চল্লিশ মিনিট 'শর্ট টার্ম কোর্স' উপহার দেন। আমার হাল তখন সুকুমার রায়ের 'শ্যামাদাস'-এর মতো। হাত-পা বাঁধা মুরগি—যার কান দিয়ে ক্রমাগত জ্ঞান ঢুকছে।

এই সমস্যাটুকু বাদ দিলে রণেন ব্যানার্জি বেশ পরোপকারী ভদ্রলোক। ওঁকে ডেকে আমি খারাপ খবরটা জানিয়ে হেলপ চাইতে পারি। বয়স্ক মানুষ—নিশ্চয়ই থানা-পুলিশ সম্পর্কে আমার চেয়ে ঢের বেশি খোঁজখবর রাখবেন।

হঠাৎ দোতলার দিকে চোখ গেল আমার। মিনতি ব্যানার্জি দোতলার বারান্দায় একটা চেয়ারে বসে আছেন। ধবধবে সাদা গায়ের রং। চুল কাঁচাপাকা। চোখ উজ্জ্বল, চকচকে। ভদ্রমহিলা ওই চেয়ারে বসে-বসেই অত্যন্ত

উঁচুমানের নজরদারি চালান। তাছাড়া পাড়ার খোঁজখবরও কিছু কম রাখেন না। সব ব্যাপারে নাক গলানো ওঁর কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। তাই আমি ওঁর নাম রেখেছি শার্লক হোমস। এবং ওঁকে আমি একটু এড়িয়েই চলি।

কিন্তু এখন, এই বিপদের সময়, ওসব ব্যাপার ভুলে গিয়ে আমি ‘মিসেস ব্যানার্জি—’ বলে চিৎকার করে ডেকে উঠলাম।

মিনতি চট করে চেয়ার ছেড়ে উঠে বারান্দার রেলিঙের কাছে চলে এলেন। রেলিং ধরে ঝুঁকে পড়লেন আমার দিকেঃ ‘কী হয়েছে? আপনি আজ অফিসে যাননি?’

আমি ওঁকে স্বর্ণমালার কথা বলতে গিয়ে হাউমাউ করে কেঁদে ফেললাম। আমার শোরগোলে রণেন ব্যানার্জি সদর দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলেন। তারপর একে-একে জড়ো হল আরও পাড়াপড়শি...জনগণ।

আর একেবারে শেষে হসপিটালের অ্যাম্বুলেন্স এবং পুলিশ।

এতক্ষণ ধরে যে-কথাগুলো বললাম, সেগুলো পুলিশকে আমি বারবার বলেছি। এতবার বলেছি যে, কথাগুলো আমার পরীক্ষার পড়ার মতো মুখস্থ হয়ে গেছে। কিন্তু উপায় কী! পুলিশ যতবার জানতে চাইবে ততবারই আমাকে বলতে হবে—বিরক্ত হলে চলবে না। পুলিশের ইনভেস্টিগেশানে আমার হান্ড্রেড পারসেন্ট কো-অপারেট করা উচিত। কারণ, আমি চাই, স্বর্ণমালার মার্ডারার ধরা পড়ুক।

সেইজন্যেই আমার মুখোমুখি বসে থাকা প্লেন ড্রেসের ডিটেকটিভ ভদ্রলোক যখন আরও একবার সেই ‘গোল্ডেন স্টোরি’ শুনতে চাইলেন, আমি গড়গড় করে শুনিয়ে দিলাম।

এই ভদ্রলোক সেই শুরু থেকেই আমার পেছনে পড়ে রয়েছেন। স্বর্ণা মারা গেছে প্রায় একমাস পেরিয়ে গেছে। পুলিশের ইনভেস্টিগেশান যে-স্পিডে শুরু হয়েছিল সেটা যথেষ্টই থিতিয়ে পড়েছে। এই নাছোড়বান্দা বৃদ্ধ ডিটেকটিভটি না থাকলে হয়তো সেই তদন্ত একেবারেই থেমে যেত। কিন্তু ইনি এখনও তদন্তের লেজ ধরে রয়েছেন। এরকম ঠ্যাঁটা ডিটেকটিভ সত্যি খুব রেয়ার।

বেশ বুঝতে পারছি, স্বর্ণমালার খুনিকে আর কখনওই ধরা যাবে না, কিন্তু তা সত্ত্বেও এই ভদ্রলোকের মহা ধৈর্য আর নিষ্ঠার তারিফ করতে হয়। ওঁকে দেখে বোঝা যায় ‘লেগে থাকা’ কাকে বলে।

ভদ্রলোকের নাম মোহনলাল পাল। বয়েস পঞ্চান্ন থেকে ষাটের মাঝামাঝি কোনও একটা সংখ্যা হবে। মোটাসোটা লম্বা চেহারা। রং ময়লা। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। তাতে যে বেশ পাওয়ার আছে সেটা বোঝা যায় লেন্সের কৃপায় মোহনলালের বড়-বড় হয়ে যাওয়া চোখ দেখে।

সেই চোখের ওপরে বেশ ঘন কাঁচা-পাকা ভুরু। মাথার চুলও একই ধরনের। দু-ভুরুর মাঝে বিরক্তির স্থায়ী ভাঁজ। কিন্তু একইসঙ্গে ওঁর মুখে সবসময় একটা হাসি-হাসি ভাব লেগে আছে। তাই ঠিক বোঝা যায় না উনি বিরক্ত, না খুশি।

তবে মোহনলালের চেহারায় সবচেয়ে অ্যাট্রাকটিভ হল ওঁর ঝাঁটা গোঁফ। ঠিক যেন একটা শজারু লম্বা হয়ে নাকের নীচে শুয়ে আছে।

আমার বাড়িতে ড্রয়িং-ডাইনিং স্পেসে আমরা বসেছিলাম। আমাদের মাঝে একটা শৌখিন টি-টেবল। টেবিলে দু-কাপ চা, আর তার পাশে একটা প্লেটে নোনতা বিস্কুট। আমরা মাঝে-মাঝে চায়ে চুমুক দিচ্ছিলাম, আর তার সঙ্গে টুকটাক করে বিস্কুট চলছিল।

আমি আড়চোখে দেওয়াল-ঘড়ির দিকে তাকালাম। চারটে বাজে। মোহনলাল এসেছেন তিনটে নাগাদ। তবে ওঁর বসার ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে না খুব শিগগির গা তুলবেন।

'বুঝলেন, রীতেশবাবু...' চায়ে চুমুক দিলেন মোহনলাল। ওঁর গলার কাছটা একটু ফোলা মতন। সেখানে বারদুয়েক আঙুল বুলিয়ে বললেন, 'আপনার ওয়াইফের মার্ডারটা ঠিক যেন একটা পারফেক্ট মার্ডার। সুন্দরী তরুণী দিনদুপুরে খুন এবং খুনি হাওয়া—পুলিশ তার নাগাল পাওয়ার কোনও ক্লু-ই পাচ্ছে না।' মাথা নাড়লেন আক্ষেপে: 'অথচ পারফেক্ট মার্ডার বলে কিছু হয় না। ওটা পুরোপুরি থিয়োরিটিক্যাল, ইম্যাজিনারি, রুট ওভার মাইনাস ওয়ান—বুঝলেন কি না?' আমার চোখে তাকিয়ে হাসলেন মোহনলাল।

আমি আর কী বলব! তাই বোকার মতো একটু হাসলাম।

শব্দ করে চায়ের কাপে চুমুক দিলেন মোহনলাল। একটু সময় নিলেন। তারপর সামান্য হেসে বললেন, 'রীতেশবাবু, জানি, লাস্ট একমাস ধরে আমি আপনাকে যাকে বলে তিতিবিরক্ত করে চলেছি। আমি হলফ করে বলতে পারি, এরকম ঠ্যাঁটা ডিটেকটিভ আপনি আগে কখনও দেখেননি। আসলে আমার নেচারটাই এই টাইপের। ছোটবেলায় অঙ্ক আটকে গেলে তার পেছনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন লেগে থাকতাম। তারপর চাকরি-বাকরি করতে এসেও তাই। কেস সলভ করতে না পারলে তার পেছনে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, এমনকি বছরের পর বছর লেগে থাকি। তা আপনার ওয়াইফের কেসটা তো সবে একমাস হয়েছে! একটা ব্যাপার কী জানেন, আমার কোনও তাড়া নেই। শুধু অঙ্কটা আমার সলভ করা চাই...।'

আমার ঘুম পেয়ে যাচ্ছিল। আজ শনিবার—ছুটির দিন। তার মধ্যে বিনা নোটিশে ভদ্রলোক তিনটের সময় এসে হাজির। কী আর করা যাবে! স্বর্ণা চলে যাওয়ার পর যে-দু-একটা রান্না রপ্ত করেছি তার মধ্যে চা একটা। তো সেটাই করে ওঁকে আপ্যায়ন করেছি। তারপর থেকে চলছে মোহনলালের অ্যাকশান রিপ্লে। কতবার যে ওঁর মুখে এসব কথা শুনেছি! ঘুমের আর দোষ কী!

চা-বিস্কুট শেষ করে হাতে তালি দিয়ে হাত ঝাড়লেন ডিটেকটিভ। গোঁফে আঙুল ঘষলেন। তারপর ছোট্ট করে দু-তিনবার কেশে বলতে শুরু করলেন।

'দেখুন, কোনও হাজব্যান্ড মার্ডার হলে প্রাইম সাসপেক্ট হচ্ছে ওয়াইফ। আবার উলটোটা হলে, মানে, ওয়াইফ খুন হলে সন্দেহ করার এক নম্বর পাবলিক হল স্বামী। আর স্ট্যাটিসটিক্স বলছে, শতকরা চুরানব্বই দশমিক তিন ভাগ ক্ষেত্রে সন্দেহটা সত্যি হয়। তা আপনার কেসেও আমরা হেলপলেস। যেহেতু আপনার ওয়াইফ মার্ডার হয়েছে তাই—আপনিই হলেন আমাদের প্রাইম সাসপেক্ট...।'

সে আমি ভালো করেই জানি। পুলিশ আমাকে যেভাবে প্রশ্নে-প্রশ্নে হ্যারাস করেছে সে আর বলার নয়। মাঝে-মাঝে আমার কান্না পেয়ে গেছে। স্বর্ণাকে হারানোর দুঃখের সঙ্গে নুনের ছিটের মতো মিশে গেছে পুলিশের জেরার যন্ত্রণা। মাঝে-মাঝে মনে হয়, স্বর্ণা যদি একটা নোট লিখে যেতে পারত যে, 'রীতেশ আমাকে খুন করেনি,' তা হলে হয়তো রেহাই পেতাম।

কিন্তু এসব তো অলীক কল্পনা। ইম্যাজিনারি। মোহনলালের ভাষায় 'রুট ওভার মাইনাস ওয়ান'।

'পয়েন্ট নাম্বার ওয়ান হল, আপনার ওয়াইফ রীতিমতো সুন্দরী, ইয়ং—তার ওপর ওঁর যৌবন দারুণ ভাইটাল—মানে, মাথা ঘুরিয়ে দেওয়ার মতো ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স...।'

মোহনলালের কথাগুলো একটু মোটা দাগের শোনালেও তথ্যগুলো সত্যি। তবে স্বর্ণমালা ফ্রিজিড—মানে, কামশীতল—ছিল। এই তথ্যটা মোহনলাল পাল জানেন না। শুধু উনি কেন, আমি ছাড়া আর কেউই জানে না। কিন্তু ফ্রিজিড বলে স্বর্ণাকে আমি কিছু কম ভালোবাসতাম না। ওকে আমি এখনও প্রতি মুহূর্তে মিস করি। স্বর্ণা! আই লাভ ইউ!

'বিয়ের পর পাঁচটা বছর কাটতে না কাটতেই আপনার ওয়াইফ এরকমভাবে ব্রুটালি মার্ডার হয়ে গেলেন। খুব স্যাড।

'আচ্ছা, শুরু থেকেই ব্যাপারটা রিকনস্ট্রাক্ট করার চেষ্টা করা যাক...।'

আবার! আমি ঠান্ডা চায়ে চুমুক দিলাম। একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল বুকের খাঁচা থেকে। কতবার যে পুলিশকে এসব কথা বলেছি। মোহনলালও বোধহয় কম করে সাড়ে চোদ্দোবার আমার বক্তব্য শুনেছেন।

কিন্তু উপায় নেই। ওঁদের তদন্তের স্বার্থে পুরোনো রেকর্ড বাজাতে হবে। তা ছাড়া মোহনলাল তো খোলাখুলি বলেই দিয়েছেন, আমাকে তিনি নাইনটি ফোর পয়েন্ট থ্রি পারসেন্ট সন্দেহ করেন। পরিসংখ্যান সে-কথাই বলছে। নাকি এই একমাসে শতকরা হিসেবের সংখ্যাটা আরও বেড়ে গেছে?

পেটে কয়েকবার হাত বোলালেন ডিটেকটিভ। তারপর বডিটাকে কাত করে যথেষ্ট কসরত করে প্যান্টের পকেট থেকে একটা ডায়েরি আর বলপয়েন্ট পেন বের করলেন। ভুরু কুঁচকে ডায়েরির পাতা ওলটাতে লাগলেন। পাতা ওলটানোর সুবিধের জন্যে তিনি বারবার জিভে আঙুল ঠেকাচ্ছিলেন।

ওঁর পুরু কালচে ঠোঁট, দাঁত হলদেটে। তার ওপরে এই জঘন্য হ্যাবিট—আমার গা ঘিনঘিন করছিল।

'আপনার ওয়াইফের ফোনটা যখন আপনি রিসিভ করেন তখন টাইম কত ছিল?' ডায়েরির পৃষ্ঠাতে চোখ রেখেই প্রশ্নটা করলেন।

ঢিলে গলায় জবাব দিলাম, 'দুটো বাজতে পাঁচ—।'

'কারেক্ট। আগে নানান সময়ে সাতবার আপনি এই একই টাইম বলেছেন...।'

'তা ছাড়া আপনারা তো আমার মোবাইল ফোনের কল রেকর্ডসও চেক করেছেন—' বিরক্ত হয়ে মন্তব্য করলাম।

কিন্তু মোহনলাল পাল আমার বিরক্তি গায়ে মাখলেন না। ডায়েরির পাতা ওলটাতে-ওলটাতেই বিড়বিড় করে বললেন, 'ইয়েস—তা চেক করেছি। আপনার ওয়াইফের মোবাইল ফোনটা তো থেঁতলে ভজহরি হয়ে গিয়েছিল—তাই সেটা চেক-টেক আর করা যায়নি। তবে সার্ভিস প্রোভাইডারের কাছ থেকে আমরা কল রেকর্ডস-এর রিপোর্ট নিয়েছি। সত্যিই স্বর্ণমালা ম্যাডাম আপনাকে সেসময় ফোন করেছিলেন। আপনি সত্যি কথাই বলছেন।' একটু চুপ করে থাকার পরঃ 'তখন আপনি অফিসে কার চেম্বারে যেন ছিলেন?'

'এইচ. আর. ম্যানেজার তুষার পারেখের চেম্বারে। ওকে জিগ্যেস করলেই ও আমার কথা করোবোরেট করবে। আসক হিম...।'

হাসলেন মোহনলাল, বললেন, 'হ্যাঁ—হ্যাঁ। সে তো জিগ্যেস করেইছি। উনি করোবোরেট করেছেন...।'

'তবে আবার আমাকে জিগ্যেস করছেন কেন?'

'মিস্টার মজুমদার, বিরক্ত না হওয়াটা একটা আর্ট। আপনি বিরক্ত হলেও আমি বিরক্ত হতে পারি না। আমরা একই কথা বারবার জিগ্যেস করি। অ্যাকশন রিপ্লে, রিপ্লে, রিপ্লে, অ্যান্ড রিপ্লে। দেখবেন, এইসব রিপ্লের ফাঁকফোকর থেকে হঠাৎ-হঠাৎ পিকিউলিয়ার সব ক্লু বেরিয়ে আসে। কেঁচোর বদলে সাপ...।' শব্দ করে হাসলেন ডিটেকটিভ। তারপর আচমকা: 'তুষার পারেখের চেম্বারে আপনি নিজে থেকে গিয়েছিলেন, নাকি উনি আপনাকে ডেকেছিলেন?'

এ-প্রশ্নটা নতুন। আগে শুনিনি।

আমি একটু চিন্তা করে জবাব দিলাম, 'আমি নিজে থেকে গিয়েছিলাম। একটা ইন্টারভিউ অ্যারেঞ্জ করার ব্যাপারে...।'

ডায়েরিতে কী যেন লিখে নিলেন মোহনলাল। ওঁর মামুলি শার্ট থেকে ঘামের গন্ধ বেরোচ্ছিল।

ডায়েরির লেখার দিকে গভীর মনোযোগে তাকিয়েছিলেন ডিটেকটিভ। সেই অবস্থাতেই বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন, 'আগেই তো আপনাকে বলেছি, আপনি আমাদের প্রাইম সাসপেক্ট। আপনাকে সন্দেহ করাটাই আমাদের ব্রত। অন্তত থিয়োরি তাই বলছে। সুতরাং, আমাদের কাজ হল আপনাকে খুনি ঠাউরে মোটিভ খুঁজে বের করা, খুনটা আপনি কী করে করলেন সেটা গেস করা—তারপর তার সাপোর্টে প্রমাণ-টমান খুঁজে বের করা।

'ইয়ং স্বামী বা স্ত্রী খুন হলে আমরা প্রথমেই একটা লাভ ট্র্যাঙ্গেল-এর কথা ভাবি। মানে, ত্রিকোণ প্রেম। এইরকম প্রেমের একটা কোণ হচ্ছেন স্বর্ণমালা ম্যাডাম, সেকেন্ড কোণটা আপনি। আর আমি—মানে, পুলিশ খুঁজে বেড়াচ্ছে তিন নম্বর কোণটা। কোথায় সেই কোণ? কে সেই কোণ?

'তো আপনার ওয়াইফের মার্ডার কেসটাকেও আমরা লাভ ট্র্যাঙ্গেল-এর অ্যাঙ্গেল থেকে ছানবিন করতে চাইছি...' কাশলেন মোহনলাল। কাশিতে কফের ঘড়ঘড়ে শব্দ হল। তারপরঃ 'তুষার পারেখের চেম্বারে আপনি তা হলে নিজে থেকে গিয়েছিলেন?'

'বললাম তো, হ্যাঁ—।'

'হুঁ—।' ডায়েরির পাতা থেকে চোখ তুলে ঘরের সিলিং-এর দিকে তাকালেনঃ 'এমনটা তো হতেও পারে রীতেশবাবু, আপনি জানতেন ওই স্পেশাল ফোনটা আসবে—তাই একজন উইটনেস রাখতে চেয়েছিলেন।'

আমি হাঁ করে শজারুর গোঁফওয়ালা ডিটেকটিভ ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে রইলাম। লোকটা বলে কী! আমি আগে থেকে জানতাম, স্বর্ণমালা 'বাঁচাও! বাঁচাও!' টাইপের কিছু একটা বলে আমাকে ফোন করবে! তার মানে তো আমি আগে থেকেই জানতাম যে, স্বর্ণা খুন হবে!

ওঃ ভগবান! লোকটার মনটা কি জিলিপি দিয়ে তৈরি? তা ছাড়া কী করেই বা এরকম একটা ফোনের কথা কেউ আগে থেকে জানতে পারে?

'আচ্ছা, মিস্টার পাল, সত্যি করে বলুন তো, এরকম একটা এস. ও. এস. ফোনের কথা কারও পক্ষে কি আগে জানা পসিবল?'

'ঠিক—ঠিক। আন্ডার নরমাল সারকামস্ট্যান্সেস, পসিবল নয়। কিন্তু আন্ডার কন্ট্রোলড সিচুয়েশান, ইট ইজ নট ইমপসিবল...।'

'তার মানে?'

'তার মানে, আপনার কোনও অ্যাকমপ্লিস—মানে, ওই তিন নম্বর কোণ—হয়তো ওই ফেক এস. ও. এস. কলটা করেছে। এবার সেটা যে আপনার ওয়াইফের গলা নয় সেটা প্রুভ করা খুব টাফ। কারণ, মোবাইল ফোনের সার্ভিস প্রোভাইডাররা যে-ভয়েস রেকর্ড পুলিশকে দেয় তাতে অনেক নয়েজ আর ডিসটরশন থাকে। ফলে ঠিকঠাক ভয়েস ম্যাচ পাওয়া খুব ডিফিকাল্ট। আমরা সার্ভিস প্রোভাইডারের কাছ থেকে ভয়েস রেকর্ড নিই কথাবার্তা শোনার জন্য আর ইনফরমেশন পাওয়ার জন্যে...।'

লোকটার মুখে সপাটে একটা ঘুসি মারতে ইচ্ছে করছিল আমার।

মোহনলাল হয়তো প্রচুর গোয়েন্দাগিরি করেছেন, কিন্তু গোয়েন্দা গল্প আমিও তো কিছু কম পড়িনি! সুতরাং কিছুটা তর্কাতর্কি ওঁর সঙ্গে করাই যায়। তাই বললাম, 'একটা কথা জিগ্যেস করছি—প্লিজ, মনে কিছু করবেন না...।'

'মনে করব কেন?' জোরে হেসে উঠে টেবিলে দু'বার আলতো চাপড় মারলেন: 'করুন কী জিগ্যেস করবেন—।'

'স্বর্ণার মোবাইল ফোনটা আমার সেই তিন নম্বর কোণের হাতে গেল কেমন করে? তারপর সেই ফোনটাই থেঁতলানো অবস্থায় দোতলার সিঁড়িতে পাওয়া গেছে। এই ব্যাপারগুলো আপনি কীভাবে এক্সপ্লেইন করবেন, মিস্টার পাল?'

ডায়েরির পাতায় চোখ রাখলেন পালবাবু। কয়েকটা পাতা এদিক-সেদিক ওলটাতে-ওলটাতে নীচু গলায় বললেন, 'রাগ করবেন না, রীতেশবাবু, এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুব একটা কঠিন নয়...' মুখ বিকৃত করে হঠাৎই ডান হাতের তর্জনী দিয়ে দাঁত খোঁচাতে লাগলেন। তারপর: 'তর্কের খাতিরে ধরা যাক, সেদিন অফিসে বেরোনোর সময় আপনি আপনার ওয়াইফের মোবাইলটা হাতসাফাই করলেন। তারপর ওটাকে বাড়ির বাইরের ফুলগাছগুলোর আড়ালে বা কাছাকাছি কোথাও লুকিয়ে রেখে অফিসে চলে গেলেন। দুটো বাজতে পাঁচে আপনার প্রেমিকা—ধরা যাক, ম্যাডাম এক্স—এখানে চলে এলেন। ফোনটা কুড়িয়ে নিয়ে চট করে কাছেই কোথাও সটকে পড়লেন। সেখান থেকে এস. ও. এস. কলটা করে ফোনটা আবার লুকিয়ে রেখে গেলেন—আপনার জন্যে।

‘মোবাইল ফোনটা কোথায়-কোথায় লুকোনো হবে সেটা আপনারা দুজনে আগেই ডিসকাস করে প্ল্যান করে নিয়েছিলেন...।’

অসহ্য! মাথাটা গরম হয়ে গেল আমার। আর চুপ করে থাকা যায় না!

‘একমাস ধরে তদন্তের নাটক করে আপনি কি শেষমেশ আমাকে ভয় দেখিয়ে ব্ল্যাকমেল করতে চাইছেন? স্বর্ণার মোবাইল ফোনের উদ্ভট রুট ওভার মাইনাস ওয়ান গল্প শোনাতে এসেছেন আমাকে!’

হাসলেন পালবাবু। গোঁফের আড়ালে চাপা হাসি। ডায়েরি আর পেন টেবিলে নামিয়ে রেখে আপনমনেই বললেন, ‘উত্তেজনা, রাগ আর বিরক্তি। আমাদের তদন্তের তিনটে হেলপলাইন। সাসপেক্টরা যখন এই তিনটে ইমোশন শো করে তখন আমাদের তদন্তের অনেক সুবিধে হয়...।’

কথা বলতে-বলতে ডায়েরিটা টেবিলে রেখে পকেট থেকে বিড়ির প্যাকেট আর লাইটার বের করলেন মোহনলাল। প্যাকেট থেকে একটা বিড়ি বের করে নিয়ে আমার দিকে ইশারা করে জিগ্যেস করলেন, ‘চলবে না কি?’

আমি জানালাম যে, আমি স্মোক করি না।

‘গুড। স্মোক না করাটা খুব ভালো। কিন্তু আমরা তো সবসময় খারাপ কাজই করি...’ লাইটার দিয়ে বিড়ি ধরালেন মোহনলাল। বিড়ির প্যাকেট এবং রঙিন প্লাস্টিকের লাইটারটাকে আবার পকেটে ফেরত পাঠালেন।

চোখ বুজে বিড়িতে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়লেন।

বিড়ির গন্ধ আমার কাছে অসহ্য। কিন্তু অসহ্য অনেক কিছুই তো এতক্ষণ ধরে সহ্য করছি!

‘রীতেশবাবু, লাস্ট একমাস ধরে আমরা যা তদন্ত করার করে নিয়েছি। আমরা এখনও আপনার ওয়াইফের মার্ডারারকে অ্যারেস্ট করতে পারিনি। খুঁজেই পাইনি তো অ্যারেস্ট! এ জন্যে আপনি কয়েকশোবার আমাদের কাছে রাগ-টাগ দেখিয়েছেন। তার উত্তরে আমরা মিনমিন করে দায়সারা কিছু জবাব দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করতে পারিনি। বলতে পারেন, অফিশিয়ালি আমাদের কেস ক্লোজড—মানে, প্রায় ক্লোজড। আমি কিন্তু আজ আপনার সঙ্গে আন-অফিশিয়ালি দেখা করতে এসেছি। না, আপনাকে ভয় দেখিয়ে ব্ল্যাকমেল করতে আসিনি। শুধু আমার কতকগুলো আইডিয়ার কথা শোনাতে এসেছি। আইডিয়াগুলো রুট ওভার মাইনাস ওয়ান টাইপের হতে পারে...।’

‘আপনি এগজ্যাক্টলি কী চান বলুন তো?’

ওঁর বিড়ির ধোঁয়ায় আমার গা গুলোচ্ছিল।

গোঁফে কয়েকবার আলতো করে আঙুল বোলালেন। তারপর গোঁফটার এদিক-ওদিক আঙুল দিয়ে চাপলেন। যেন গোঁফটা নকল—চেপেচুপে ঠিকঠাক করে না বসালে এখুনি খুলে যাবে।

‘কিছুই চাই না—শুধু কতকগুলো আইডিয়ার কথা শোনাতে এসেছি। যেমন ধরুন, বাড়িতে ঢুকে মার্ডারার আপনার ওয়াইফকে মার্ডার করার পর সম্ভবত সেই ব্লান্ট ইনস্ট্রুমেন্ট দিয়েই আপনার ওয়াইফের মোবাইলটাকে থেঁতলে চুরচুর করে দিয়েছে।

‘যদি মার্ডারার টাকাপয়সা গয়নাগাটি লুঠ করার জন্যেই বাড়িতে ঢুকে থাকে তাহলে আপনার বউয়ের মোবাইলটাকে সে খামোখা থেঁতো করতে যাবে কেন? এই কোশ্চেনটার উত্তর আমরা খুঁজে পাইনি।

‘আবার মার্ডারার যদি স্বর্ণমালা ম্যাডামের চেনা কেউ হন—মানে, ধরুন, আপনি—তা হলেও তো ওই কোশ্চেনটার কোনও উত্তর পাওয়া যাচ্ছে না। কারণ, মোবাইল থেঁতো করলেই তো আর কল রেকর্ডস উধাও হয়ে যাবে না!

‘তাহলে মোবাইলটা স্ম্যাশ করার কারণ কী হতে পারে?’ হাসলেন মোহনলাল পাল। চাপা খুকখুক শব্দ হল। তারপর গলাখাঁকারি দিয়ে বললেন, ‘কারণটা হল, একটা পাজল তৈরি করে পুলিশকে মিসগাইড করা। আর...আর...মোবাইলটা ফুলগাছের আড়ালে বা অন্য কোথাও লুকিয়ে রাখার জন্যে যদি সেটার গায়ে ধুলো-

মাটির কণা লেগে-টেগে থাকে সেসব যেন থেঁতলানো মোবাইলের ফোরেনসিক টেস্টে ট্রেস না করা যায়। তো সত্যি-সত্যিই আমরা সেরকম কোনও ট্রেস পাইনি।' মোহনলাল বিড়িতে ঘন-ঘন টান দিলেন।

আমি মুখটা শক্ত করে চুপচাপ বসে রইলাম। স্বপ্নেও ভাবিনি যে, স্বর্ণা খুন হওয়ার একমাস পরেও আমি এভাবে হ্যারাসড হতে পারি। মোহনলাল লোকটার দেখছি সৌজন্য, সঙ্কোচ, ভদ্রতা, লাজ, লজ্জা কিছুই নেই!

'এবারে আসা যাক আপনার এ-বাড়ির সদর দরজার ব্যাপারটায়...। এ-ব্যাপারে তেমন কোনও মিস্ট্রি নেই, কারণ, আপনি তদন্তের শুরুতেই আমাদের বলেছিলেন, খুনের ঘটনার মাসখানেক আগে আপনার সদর দরজার একটা চাবি হারিয়ে গিয়েছিল। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও সেটা পাননি বলে শেষ পর্যন্ত আপনি চাবিওয়ালা ডেকে একটা ডুপ্লিকেট চাবি তৈরি করান।

'প্রথমে আপনি আমাদের এ-বিষয়ে কিছু বলেননি। ইন ফ্যাক্ট চাবিওয়ালা ডেকে চাবি তৈরির ব্যাপারটা আমরা প্রথম জানতে পারি আপনার পাশের বাড়ির মিসেস মিনতি ব্যানার্জির কাছ থেকে। তারপর তো ডুপ্লিকেট চাবি নিয়ে যা-যা কোশ্চেন করার সেসব আমরা আপনাকে করেছি। আপনি অনেস্টলি সেসব কোশ্চেনের উত্তর আমাদের দিয়েছেন। আমরা...।'

মোহনলাল আরও যেসব কথা বলছিলেন সেগুলো আমার মাথায় ঢুকছিল না। শার্লক হোমস মিসেস ব্যানার্জির কথা ভাবছিলাম। ভদ্রমহিলার মতো এত দায়িত্ববান এবং একনিষ্ঠ নোজি পার্কার সত্যিই রেয়ার। আসলে চাবি তৈরির ব্যাপারটা প্রায় মাসখানেকের পুরোনো ছিল বলে আমার মাথা থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। তা ছাড়া স্বর্ণমালার আচমকা খুন হওয়া! ওফ, আমার দুনিয়াটা পুরো টপসি-টারভি হয়ে গিয়েছিল। এখনও সেটা মাঝে-মাঝে টাল খাচ্ছে। মোহনলাল পাল সেসব জ্বালা-যন্ত্রণার কী বুঝবেন! আমার মনে হল, এই ছোটলোকটা বোধহয় কখনও যুবক ছিল না। আর থাকলেও কখনও কাউকে ভালোবাসেনি।

ওঃ, চাবি হারানোর ব্যাপারটা নিয়ে মোহনলাল অ্যান্ড কোম্পানি আমাকে কম জ্বালিয়েছে!

স্বর্ণমালা একটা ছোট সফটওয়্যার কোম্পানিতে পার্টটাইম চাকরি করত। তাই আমাদের দুজনের কাছেই একটা করে চাবি থাকত। হারিয়ে গিয়েছিল ওর চাবিটাই। তখন আমি দরজার লকটা পালটানোর কথা বলেছিলাম, কিন্তু স্বর্ণা অত খরচ আর ঝঞ্ঝাট করতে রাজি হয়নি। তখন বলতে গেলে ওর চাপেই আমি চাবিওয়ালা ডেকে ডুপ্লিকেট চাবি তৈরির ব্যবস্থা করি। কিন্তু আমি কল্পনাও করিনি, সেই হারানো চাবি কোন জটিল প্রসেসে স্বর্ণার মার্ডারারের হাতে গিয়ে পড়বে, আর স্বর্ণার এরকম সর্বনাশ হবে। সেইসঙ্গে আমারও।

মোহনলাল বিড়ি শেষ করে টুকরোটা নির্বিকারভাবে মেঝেতে ফেলে পা দিয়ে ঘষে দিলেন। তারপর ধীরে-ধীরে বললেন, 'এবার ধরুন, মিস্টার মজুমদার, ওই চাবি- এপিসোডটা পুরোপুরি আপনার ম্যানিপুলেট করা...।'

'কী বলছেন আপনি?' চেয়ার ছেড়ে এক ঝটকায় দাঁড়িয়ে পড়েছি আমি, 'চাবি হারানোর ব্যাপারটা আমার কারসাজি? নাটকবাজি? আপনি এই মুহূর্তে রাস্তা মাপুন—দয়া করে বেরিয়ে যান—এক্ষুনি!'

মোহনলাল বাচ্চা ছেলের মতো হেসে ফেললেন। বললেন, 'আরে বসুন, বসুন, রীতেশবাবু। আপনাকে আলাদা করে আর বলা হয়নি যে, আমি খুব ঠ্যাঁটা টাইপের ডিটেকটিভ। অত সহজে আমি রাস্তা মাপি না। তা ছাড়া, আমি তো বলিনি, আপনি চাবি-এপিসোডটা ম্যানিপুলেট করেছেন। আমি বলেছি ''ধরুন''—মানে, মনে করুন। তাতেই এত চটে যাচ্ছেন কেন? এরকম চটে গেলে আপনার ওপরে সন্দেহ তো আরও বাড়বে...।'

আমি একটা বড় শ্বাস ফেললাম। মোহনলাল কি আমাকে লেজে খেলাচ্ছেন? আমার ওপরে এইরকম মেন্টাল টরচার আর কতদিন চলবে?

চেয়ারে বসে পড়লাম আবার। এ কী বিরক্তিকর ইঁদুর-বেড়াল খেলা! যদি ওরা মনে করে আমিই মার্ডারার তা হলে আর দেরি কীসের! আমাকে বিচারের নাটক করে যাবজ্জীবনে ঢুকিয়ে দিক কিংবা ফাঁসিতে ঝুলিয়ে

দিক। এই লাইফ আর ভালো লাগছে না।

ডায়েরিটা টেবিল থেকে হাতে তুলে নিলেন আবার। পাতা ওলটাতে লাগলেন। তারপর চোখ তুলে আমার দিকে তাকালেন: 'চাবির ব্যাপারটা আপনি গোড়াতে আমাদের বলেননি। ইচ্ছে করেই বলেননি। আপনি চাইছিলেন আমরা খোঁজখবর করে ব্যাপারটা উৎঘাটন করি। তা হলে আপনাদের হারানো চাবি হাতিয়ে নিয়ে খুনি আপনার বাড়িতে ঢুকেছে এই থিয়োরিটা আমরাই তৈরি করে আপনার প্লেটে সার্ভ করব...।'

'মিস্টার পাল, এবারে আপনি আসুন। আমার শরীর বা মনের অবস্থা ভালো নয়। আমার মাথাটা অসম্ভব ব্যথা করছে। ভুরুর ওপরটা দপদপ করছে। সত্যিই আমি আর নিতে পারছি না...।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন মোহনলাল। তারপর বেশ নরম গলায় বললেন, 'রীতেশবাবু, প্রায় একমাস ধরে আমরা আপনার ওয়াইফের মার্ডারের তদন্ত-টদন্ত করেছি, কিন্তু সেরকম কিছু করে উঠতে পারিনি। আর, জুতসই কোনও প্রমাণ-টমানও পাইনি। আপনি প্রাইম সাসপেক্ট হলেও আমরা আপনার এগেইনস্টে কোনও স্টেপ নিতে পারিনি। তা ছাড়া, আমরা কীভাবে তদন্ত করেছি, কী-কী সন্দেহ করেছি, কী-কী থিয়োরি অ্যাপ্লাই করে মার্ডারটাকে রিকনস্ট্রাক্ট করেছি সেসব কিছুই আপনাকে বলিনি। আপনাকে সেসব খোলাখুলি বলব বলেই আজ আমার এই আন-অফিশিয়াল ভিজিট। সেজন্যেই এত মন খুলে আজ আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারছি। আপনি মনে কিছু করবেন না—।'

যাক, শজারুটার বিবেক-টিবেক আছে তা হলে!

'এবারে ধরুন, আপনাদের হারানো চাবি দিয়ে দরজা খুলে খুনি আপনার বাড়িতে ঢুকল। তার মোটিভ ছিল টাকাপয়সা সোনা-টোনা হাতানো। কিন্তু আপনার স্ত্রীকে দেখতে পেয়েই সে আর সময় নষ্ট করেনি। একটা ব্লান্ট ইনস্ট্রুমেন্ট স্ট্রেট আপনার ওয়াইফের মাথায় বসিয়ে দিয়েছে। এই ধরনের ইনস্ট্রুমেন্ট বা ওয়েপন খুনিরা সঙ্গে নিয়ে ঘোরে না। ভিকটিমের বাড়িতে ঢুকে এমার্জেন্সি সিচুয়েশানে হাতের কাছে যেটাই পায়—যেমন ধরুন, টিভির পাশে ওই যে পেতলের ফুলদানিটা—' আঙুল তুলে ফুলদানিটা পয়েন্ট করলেন মোহনলাল: 'সেটা নিয়েই অ্যাটাক করে। কিন্তু আপনার ওয়াইফের মার্ডার ওয়েপনটা আমরা আজ পর্যন্ত ট্রেস করতে পারিনি। তা ছাড়া, আরও একটা প্রবলেম আমরা ফেস করেছি। সেটা হল...।

'সেটা হল, আপনার ওয়াইফের বডি পাওয়া গেছে দোতলায়, মানে, ছাদে যাওয়ার সিঁড়িতে। বাড়িতে ঢোকার সদর দরজা থেকে ওই জায়গাটা অনেকটা দূরে। তার মানে, মার্ডারারকে নোটিশ করার পর আপনার ওয়াইফ চিৎকার-চেঁচামেচি করবার প্রচুর সময় পেয়েছিলেন। তা হলে তিনি ''রীতেশ! রীতেশ! হেলপ! বাঁচাও! বাড়িতে একটা লোক ঢুকে পড়েছে! শিগগির এসো—!'' শুধু এইটুকু কথা বলে থামবেন কেন? তা ছাড়া আপনার কাছে এই হেলপ চাওয়ার ব্যাপারটা একটু পিকিউলিয়ারও বটে। এ-কথা আমরা আগেও আপনাকে বলেছি। ওইরকম একটা এমার্জেন্সির সময় আপনি অফিস থেকে ছুটে এসে বউকে হেলপ করবেন এটা কি একটু রুট ওভার মাইনাস ওয়ান টাইপের প্রত্যাশা নয়? বরং আপনার ওয়াইফ চিল-চিৎকার করে পাশের বাড়ির লোককে ডাকতে পারতেন...।'

'দেখুন, স্বর্ণা কেন ওইভাবে চিৎকার করে হেলপ চেয়েছে তা তো আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়—।'

'হ্যাঁ, এ-কথাই আপনি বারবার বলে এসেছেন। সত্যিই তো, আপনি কেমন করে জানবেন। কিন্তু ব্যাপারটা আমাদের—মানে, আমাকে খুব ভাবিয়েছে। একইসঙ্গে ভাবিয়েছে ব্লান্ট ইনস্ট্রুমেন্টের ব্যাপারটা। আপনার ওয়াইফের স্কাল যেভাবে চুরমার হয়ে গেছে তাতে এটা শিয়োর যে, ওয়েপনটা খুব হেভি টাইপের। বডির পোস্টমর্টেম যিনি করেছেন সেই ডক্টর এবং ফোরেনসিক এক্সপার্টরা এ-ব্যাপারে একমত হয়েছেন। আপনার এই বাড়ি তন্নতন্ন করে সার্চ করে আমরা মাত্র দুটো হেভি টাইপের ব্লান্ট ইনস্ট্রুমেন্ট পেয়েছি...।' মোহনলাল একটু থামলেন। ডায়েরিটা টেবিলে রাখলেন। মুখ মুছলেন। গোঁফে বারকয়েক চাপ দিলেন। চোখ থেকে চশমা খুলে নাকের গোড়ায় একটু মাসাজ করলেন। তারপর চশমাটা চোখে দিয়ে মুখ খুললেন, 'হ্যাঁ—

দুটো। একটা ওই ফ্লাওয়ার ভাস—আর দু-নম্বরটা হল আপনাদের রান্না করার প্রেশার কুকার। তিন লিটারের—হেভি মেটাল বেস...।'

এসব কথা আমি প্রথম শুনছি।

আমি কল্পনায় দেখতে পেলাম, খুনি ফুলদানিটা বাগিয়ে ধরে সেটার পেছনটা পাশবিক শক্তিতে বসিয়ে দিচ্ছে স্বর্ণার মাথায়। স্বর্ণা চিৎকার করার সময়টুকুও পেল না।

তারপরই ফুটে উঠল দ্বিতীয় দৃশ্যটাঃ ব্যাপারটা প্রথম দৃশ্যের মতোই, তবে এবারের অস্ত্রটা প্রেশার কুকার—খুনি তার হাতলটা শক্ত মুঠোয় ধরে রয়েছে।

'আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে, মার্ডার সিন ইনস্পেকশন করার সময় আমরা দেখেছিলাম, রান্নাঘরে বাসনপত্রগুলো—মানে, মেটালের বাসন-পত্রগুলো সব মেঝেতে ছড়ানো, আর মেঝেটা ভিজে। বাসনগুলোর গায়েও জল-টল লেগে ছিল। ওইসব বাসনের মধ্যে প্রেশার কুকারটাও ছিল। কুকারটা ল্যাবে পরীক্ষা করে দুটো জিনিস পাওয়া গেছে: ইন্টারেস্টিং জিনিস। এক, কুকারের তলাটা টোল খাওয়া—মানে একটু বসে গেছে—যেটা আপনি বলেছেন, কীভাবে কোথায় যেন গুঁতো খেয়ে ওই ডেন্টটা অনেক আগেই হয়েছিল। আর সেকেন্ড পয়েন্টটা হচ্ছে, কুকারের গায়ে সাবানের ফাইন পার্টিকলস পাওয়া গেছে। যেটা ইন্ডিকেট করছে, কুকারটা সেদিন সাবান দিয়ে ধোওয়া হয়েছিল।'

আমি ধৈর্য ধরে মোহনলাল পালের কথা শুনছিলাম। এসব কথার উত্তরে কীই-বা বলব! খুনি কেন কী করেছে সেসব খুনিই জানে। আমি শুধু ভাবছিলাম, এই বিরক্তিকর শজারুটা কখন আমার বাড়ি থেকে বেরোবে।

ফোঁস করে শ্বাস ছাড়লেন মোহনলাল। ডায়েরিটা টেবিল থেকে আবার তুলে নিয়ে পাতা ওলটাতে শুরু করলেন। কয়েক সেকেন্ড পর থেমে-থেমে নীচু গলায় বললেন, 'এত সব পয়েন্ট ছানবিন করে ক্রাইমটা বারবার থিয়োরিটিক্যালি রিকনস্ট্রাকট করে আমাদের স্ট্রংলি মনে হয়েছে এটা ইনসাইড জব। কারণ, অনেক ফাঁকফোকর খুঁজে পাচ্ছি—অনেক প্রশ্ন উঠছে। যেমন, বাইরের কোনও লোকের পক্ষে রান্নাঘর থেকে প্রেশার কুকারটা নিয়ে এসে ব্লান্ট ইনস্ট্রুমেন্ট হিসেবে ব্যবহার করাটা খুবই অস্বাভাবিক এবং হাস্যকর। কিন্তু কী করব, আমাদের হাতে কোনও প্রমাণ নেই। আমরা শুধু আপনাকে সন্দেহ করতে পারি—ব্যস, এই পর্যন্ত। যদি সত্যি-সত্যিই মার্ডারটা আপনি করে থাকেন, রীতেশবাবু, তা হলে সেটা আপনি করেছেন সেদিন দুপুরে অফিস থেকে বাড়িতে আসার পর। তারপর খুনিকে খোঁজাখুঁজির নাম করে প্রচুর সময় নষ্ট করেছেন—সবশেষে থানায় খবর দিয়েছেন। যাতে খুনের এগজ্যাক্ট টাইমটা ঝাপসা হয়ে যায়...।'

ডায়েরি বন্ধ করে পকেটে ঢোকালেন ডিটেকটিভ। পেটে হাত বোলালেন দু'বার। তারপর: 'আমার হিসেব মতো এই খুনের ধাঁধায় একটা তিন নম্বর কোণ থাকার কথা...কিন্তু ব্যাড লাক, সেটাই খুঁজে পেলাম না। যদি খুঁজে পেতাম তা হলে এই কেসটা আর পারফেক্ট মার্ডারের চেহারা নিতে পারত না...।' উঠে দাঁড়ালেন মোহনলাল।

যাক বাবা, ওঁর জ্ঞানের কচকচি শেষ হয়েছে তা হালে!

ইস, যদি সত্যিই একটা তিন নম্বর কোণ থাকত আমার! ধরা যাক, ওর নাম রোজালি—যার সারা শরীরে যৌবন মাখামাখি। যাকে শুধু চোখে দেখেই একটা পুরুষ জেগে ওঠে। যে স্বর্ণমালার মতো কামশীতল নয়, বরং উষ্ণকাম—উঁহু, তপ্তকাম। যার সঙ্গে বিছানায় হুড়োহুড়ি দাপাদাপির পর সব পুরুষই তপ্তকাম থেকে তৃপ্তকাম। যার কথা মনে পড়লেই শরীর আঁকুপাঁকু করে।

সদর দরজা খুলে আমরা বাড়ির বাইরে এলাম।

মোহনলাল আচমকা জিগ্যেস করলেন, 'হারানো চাবিটা খুঁজে পেয়েছেন?'

আমি অবাক হয়ে ডিটেকটিভের দিকে তাকালাম। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর ঠান্ডা গলায় বললাম, 'না, পাইনি—পেলে সঙ্গে-সঙ্গে আপনাদের জানাতাম...।'

হাসলেন মোহনলাল।

আর ঠিক তখনই পাশের বাড়ির দরজা খুলে মিসেস ব্যানার্জি বেরিয়ে এলেন। হাতে নীল রঙের একটা প্লাস্টিকের বালতি আর মগ। রোজ সন্ধের মুখে উনি তুলসীমঞ্চে জল দিতে আসেন। তুলসীমঞ্চের পাশে খানিকটা ফাঁকা জমিতে কয়েকটা ফুলগাছ রয়েছে। তুলসী গাছের পর সেই গাছগুলোর গোড়াতেও জল দেন।

আমার বাড়ি আর ওঁদের বাড়ির মাঝে খাটো পাঁচিল। তাই আমাকে দেখতে পেয়েই একগাল হাসলেন। তখনই বোঝা গেল মিসেস ব্যানার্জি এককালে যথেষ্ট সুন্দরী ছিলেন।

'রীতেশ, কেমন আছ এখন? তোমাকে তো দেখতেই পাই না—।'

ভদ্রমহিলা মাঝে-মাঝে বড় ভাট বকেন। গায়ে পড়ে পাড়ার এর-তার গল্প শুরু করে দেন। মোহনলাল পালের সামনে উনি আবার কী বলতে কী বলবেন এই ভেবে আমি ওঁকে কাটাতে চাইলাম। বললাম, 'আছি একরকম। মন-টন ভালো নেই...।'

'কী করে ভালো থাকবে! তোমার ওপর দিয়ে যে-ঝড়টা গেল...।' মিসেস ব্যানার্জি এরপর মোহনলালের দিকে তাকালেন। ওঁকে বিলক্ষণ চিনতে পারলেন। হেসে বললেন, 'আপনি ভালো আছেন?'

মোহনলাল সৌজন্যের হাসি হাসলেনঃ 'চলে যাচ্ছে, মিসেস ব্যানার্জি। আপনারা ভালো আছেন তো?'

শেষ প্রশ্নটা যেন শুনতেই পেলেন না মিনতি। নিজের কথা বলে চললেন।

'আপনি আবার এসেছেন—তদন্তের কাজ কি মেটেনি না কি? মার্ডারারকে ধরতে পারলেন?' মিসেস ব্যানার্জির কপালে ভাঁজ, চোখে কৌতূহল।

এই নাকগলানে বুড়ির প্রশ্নমালা শুনে আমার বিরক্ত লাগছিল।

বালতি আর মগ হাতে নিয়েই বাউন্ডারি ওয়ালের কাছে চলে এলেন। আমার দিকে সরাসরি তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা, রীতেশ, তুমি সেই মেয়েটার কথা পুলিশকে বলেছিলে তো?'

'কোন মেয়েটার কথা বলছেন বলুন তো?'

'ওই যে...যে-মেয়েটার কথা আমি ওঁদের একজন কনস্টেবলকে রিপোর্ট করেছিলাম—বড়কর্তাদের আর বলা হয়নি। ওই কনস্টেবলটা একটু মাতব্বর টাইপের ছিল—সাহেবদের বলেছে কি বলেনি। সেজন্যে তোমাকেও তো বলেছিলাম—মনে নেই?'

মোহনলাল ভুরু কুঁচকে আমার দিকে তাকালেন।

আমি এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়লামঃ 'আমার তো কিছুই মনে পড়ছে না, মিসেস ব্যানার্জি...।'

'মনে পড়ছে না?' হাতের বালতি আর মগ তড়িঘড়ি মেঝেতে নামিয়ে চোখ একেবারে কপালে তুললেন: 'সেই যে, তোমার বউয়ের মার্ডারের দিন দুপুরবেলা একটা মেয়ে আমাদের বাড়ির ওপাশটায় মল্লিকদের ফাঁকা জমিটায় দাঁড়িয়ে ফোন করছিল। আমি তখন খাওয়াদাওয়া সেরে ওইদিকের জানলার কাছে দাঁড়িয়েছিলাম...' মোহনলালের দিকে তাকিয়ে একটু দুষ্টুমির হাসি হেসে বললেন, 'জানেন তো, স্যার, আমার সব ব্যাপারে ইন্টারেস্ট। রোজ দুপুরে একটা ছেলে আর মেয়ে ওই জমিতে একটা গাছতলায় প্রেম করতে আসে। তার মধ্যে মাঝে-মাঝে অ্যাডাল্ট সিনও থাকে। সেদিন ওরা আসার আগেই এই মেয়েটা এল। দারুণ দেখতে। ডাঁসা চেহারা। কাকে যেন ফোন করছিল। মেয়েটা ফোনে বলছিল, ''রীতেশ! রীতেশ! হেলপ! বাঁচাও! বাড়িতে একটা লোক ঢুকে পড়েছে! শিগগির এসো—!'' রীতেশকে আমি এই পিকিউলিয়ার ব্যাপারটা বলেছিলাম। কিন্তু ও ঝড়ঝাপটা আর টেনশানে সেসব আপনাদের বলতে ভুলে গেছে...।'

মোহনলালের দিকে চোখ গেল আমার।

তিনি তখন আমারই দিকে তাকিয়ে। মিটিমিটি হাসছেন।

যেন বলতে চাইছেন, পারফেক্ট মার্ডার বলে কিছু হয় না। ওটা পুরোপুরি থিওরিটিক্যাল। ইম্যাজিনারি। রুট ওভার মাইনাস ওয়ান...।

তুমি যখন আঠেরো প্লাস

—তখন তোমার জীবন যাবে পালটে। আসলে এই আঠেরো সংখ্যাটার মধ্যেই একটা ম্যাজিক আছে। কিশোরী থেকে তরুণী হয়ে ওঠার ম্যাজিক। এই ম্যাজিক মোমেন্টের ওদিকে তুমি ছিলে কিশোরী—আর এদিকে ঝলমলে তরুণী। দ্য সুইচিং পয়েন্ট। যেন এই পারটিকুলার মোমেন্টে তুমি একটা লুকোনো সুইচ অন করে দিলে, আর তোমার মাইন্ড, বডি অ্যান্ড সোলে দপ করে নানান রঙের আলো জ্বলে উঠল। বল, ঠিক বলছি না?' চট করে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে রাস্তার একটা বাঁককে ম্যানেজ করলেন সোমরঞ্জন। তারপর ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনের সিটে বসে থাকা মেয়ে রূপরেখার দিকে তাকিয়ে চোখ নাচালেন।

সোমরঞ্জনের পাশে বসে থাকা রূপশ্রী স্বামীর গালে আলতো চাপ দিয়ে ওঁর মুখটাকে সামনের রাস্তার দিকে ঘুরিয়ে দিলেন: 'নাও, এবার সামনে তাকাও—নইলে অ্যাক্সিডেন্ট করে বসবে!' তারপর রূপরেখার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বুঝলি, রুপি, ইয়াং এজে তোর ড্যাড সাহিত্য-টাহিত্য করত। ওই লিটল ম্যাগ নিয়ে বিগ-বিগ ব্যাপার...।'

'লিটল ম্যাগের মর্ম তুমি কোনওদিনই বুঝতে চাইলে না, শ্রী।' সোমরঞ্জন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'আর তেমনই বোঝোনি আঠেরো বছর বয়েসটা ছুঁয়ে ফেলার মর্ম। টুডে ইজ আ গ্রেট ডে ফর রুপি। আর অ্যাপ্রক্সিমেটলি এক ঘণ্টার মধ্যে ও সেই ম্যাজিক মোমেন্টকে টাচ করে ফেলবে। আমরা তিনজনে মিলে সেই ইভেন্টটাকে সেলিব্রেট করব...।'

যদিও ওকে ঘিরেই সব কথাবার্তা তবুও রূপরেখা চুপ করেই ছিল। তাকিয়ে ছিল সামনের কালো রাস্তার দিকে। হেডলাইটের সাদা আলো পড়েছে সেখানে। সেই আলোয় রুপোলি ঝালরের মতো চিকচিক করছে ঝিরিঝিরি বৃষ্টির মিহি ফোঁটা।

আজ বিকেল থেকেই ড্যাড আর মমের সঙ্গে ডে-আউটে বেরিয়েছে রূপরেখা। আজ ওর জন্মদিন ঠিকই, কিন্তু ড্যাড আর মম সেটা নিয়ে যেন একটু বেশিরকম আদেখলেপনা করছে। বলছে, আঠেরো বছর পার করে উনিশ ছুঁয়ে ফেলাটা নাকি দারুণ স্পেশাল ব্যাপার।

অন্যান্য বছরেও তো রূপরেখার জন্মদিন আসে, জন্মদিন যায়। সেই দিনগুলোয় জন্মদিনের সেলিব্রেশানও করা হয়। কয়েকজন বন্ধুবান্ধব আসে, ড্যাড অফিস থেকে সেদিন জলদি-জলদি ফেরে। মম একটা বিউটি পার্লার চালায়। কিন্তু রুপির বার্থডের দিন তিন ঘণ্টা আগে পার্লার বন্ধ করে বাড়ি চলে আসে। তারপর সবাই মিলে হই-হুল্লোড় হয়, খাওয়া-দাওয়া হয়। বেশ মজা আর আনন্দে কাটে দিনটা।

কিন্তু এবার ব্যাপারটাই যেন আলাদা।

মম দু-দিন আগে থেকেই বলে দিয়েছে, রুপির এবারের জন্মদিনটা একটু অন্যরকম, কিন্তু দারুণভাবে সেটা সেলিব্রেট করা হবে। এবং সেই স্পেশাল সেলিব্রেশানে থাকবে শুধু তিনজন: রূপরেখা, ওর মম, আর ড্যাড। মম আর ড্যাড এও বলেছে, এবারে আর ইনডোর সেলিব্রেশান নয়, সবটাই হবে আউটডোরে, খোলা আকাশের নীচে, প্রকৃতির খুব কাছাকাছি।

বিকেল চারটে বাজতে না বাজতেই ওরা তিনজন গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। স্টিয়ারিং-এ সোমরঞ্জন। পাশে রূপশ্রী। আর পিছনের সিটে বার্থডে গার্ল রূপরেখা।

আকাশে তখন মেঘ থাকলেও একটা কনে-দেখা-আলো ছড়িয়ে ছিল চারিদিকে। কিন্তু তারপর মেঘের ওপরে মেঘ জমেছে। শুরু হয়েছে বৃষ্টি—তবে তেমন জোরে নয়, ঝিরিঝিরি। যেমন এখন চলছে।

সোমরঞ্জন গাড়ি চালাচ্ছিলেন, আর আপনমনে বকবক করছিলেন। রূপরেখার ছোটবেলার কথা বলছিলেন, বলছিলেন ওর স্কুলজীবনের নানান কাণ্ড-কারখানার কথা। যেমন, ও ছোটবেলায় টিফিন না খেয়ে সেটা স্কুলের উঠোনের গাছতলায় ঘুরে বেড়ানো 'ম্যাঁও' আর উড়ে বেড়ানো কাককে খাইয়ে দিত।

সেটা জানাজানি হওয়ার পর মম যখন ওকে জিগ্যেস করেছে, 'এ কী ব্যাপার, রুপি! তুমি নিজের টিফিন এভাবে বিলিয়ে দাও কেন?' তখন রুপি বলেছে, 'ওরা তো রোজ স্কুলে আসে, কিন্তু টিফিন আনে না! তাই আমি ওদের টিফিন খাওয়াই—।'

একবার ওর স্কুলের এক ম্যাডাম বিয়ের জন্য বেশ কিছুদিন ছুটি নিয়েছিলেন। তো বিয়ের পর তিনি যখন আবার ওদের ক্লাস নেওয়া শুরু করেন তখন রূপরেখা আচমকা উঠে দাঁড়িয়ে ম্যাডামকে বলেছিল, 'ম্যাম, আমিও আপনার মতো বিয়ে করব, সিঁদুর পরব—।'

গোটা ক্লাস জুড়ে হাসির রোল উঠেছিল।

ম্যাডাম একটুও রাগ না করে ওকে বলেছিলেন, 'অফ কোর্স বিয়ে করবে, সিঁদুর পরবে। তবে তোমাকে চোদ্দো-পনেরো বছর ওয়েট করতে হবে, রূপরেখা—।'

আবার হাসির রোল।

হাসির রোল উঠেছে গাড়িতেও। সোমরঞ্জন কথায়-কথায় হেসে ওঠেন। আর ওঁর হাসি মানেই অট্টহাসি। হাসির সঙ্গে-সঙ্গে ওঁর ভুঁড়ি কেঁপে-কেঁপে ওঠার কথা, কিন্তু স্টিয়ারিংটা ভুঁড়িতে চেপে বসায় কাঁপুনির অসিলেশানে ড্যাম্পিং ফ্যাক্টর কাজ করছে।

রূপশ্রী ভুরু কুঁচকে স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'উঃ, এত জোরে-জোরে হাসছ কেন? আমার ডানদিকের কানটা তো কালা হয়ে যাবে—!'

রূপরেখা সোমরঞ্জনের কলারে ছোট্ট টান মেরে বলল, 'ওঃ, ড্যাড! তুমি এত জোরে হাসো যে ভীষণ আনসিভিলাইজড। তোমাকে অফিসে কিছু বলে না? জানো, এরকম লাউডলি হাসলে গ্র্যাভিটি কমে যায়!'

'শোন, শোন, রুপি। মোটাসোটা মানুষরা দিলখোলা হয়, তাই প্রাণ খুলে হাসে। আর যারা...।'

সোমরঞ্জন আড়চোখে স্ত্রীকে দেখলেন। রূপশ্রী যথেষ্ট স্লিম। এবং রোগা থাকার চেষ্টায় বলতে গেলে ঘাস-পাতা ইত্যাদি খেয়ে দিনযাপন করেন। আর রূপরেখাও বেশ তন্বী। সুতরাং, সোম বুঝলেন, ওঁর সেনটেন্সের শুরুটা ভুলভাল হয়ে গেছে। তাই মরিয়া হয়ে কারেকশনের চেষ্টায় বললেন, 'আর যারা রোগা, তারাও দারুণ দিলখোলা দিলদরিয়া হয়। তা ছাড়া তারা দেখতেও হেবি সুন্দর হয়...।'

রূপরেখা পিছনের সিট থেকে বলে উঠল, 'ড্যাড, কী হচ্ছে এবার?'

গাড়ির ভেতরে ওরা তিনজনে এরকম মজা-মশকরায় মশগুল ছিল।

নির্জন রাস্তা ধরে একঘেয়েভাবে গাড়ি চলছিল। রাস্তা কখনও-কখনও বাঁক নিচ্ছিল। রূপরেখা গুনগুন করে গান করছিল। রূপশ্রীও তার সঙ্গে গুনগুনিয়ে গলা মেলালেন।

হঠাৎই রাস্তার ধারে একটা সাইনবোর্ড চোখে পড়ল রুপির।

গাড়িতে এসি চলছে বলে সব কাচ তোলা। বাইরে ঝিরঝিরে বৃষ্টি। জানলায় ভাপ জমেছে। কিন্তু এতরকম অসুবিধে থাকা সত্ত্বেও সাইনবোর্ডের লেখাটা রুপি পড়তে পারল, কারণ, ও উইন্ডশিল্ডের মধ্যে দিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে ছিল। অনেকক্ষণ ধরে গাড়ি চলছে বলে ওর একটু একঘেয়ে লাগছিল। লাস্ট ফর্টি মিনিটস ধরে ড্যাড গাড়ি চালাচ্ছে তো চালাচ্ছেই! তাই ও নতুন কিছু দেখার আশায় মুখিয়ে ছিল।

সাইনবোর্ডের লেখাটা ভারী অদ্ভুত:

Unsafe Road
Drive Carefully
অ-নিরাপদ রাস্তা
সাবধানে গাড়ি চালান

কেন? রাস্তাটা নিরাপদ নয় কেন? সাবধানে গাড়ি চালাতেই বা বলছে কেন?

রুপির কপাল ভালো যে, ইংরেজিটা সঙ্গে থাকার জন্য সরকারি বাংলা 'অ-নিরাপদ' পড়ে ও আসল মানেটা বুঝতে পেরেছে।

কিন্তু ব্যাপারটা কী? কীসের ভয় আছে এখানে?

সে-কথাই ও রূপশ্রীকে জিগ্যেস করলঃ 'মম, এই রাস্তাটায় কীসের ভয়? কেয়ারফুলি ড্রাইভ করতেই বা বলছে কেন?'

রূপশ্রী কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করলেন। তাকালেন সোমরঞ্জনের দিকে। অন্ধকারে ওঁর মুখটা ভালো করে দেখা যাচ্ছে না। দু-হাতে স্টিয়ারিং মুঠো করে ধরে আছেন। তাকিয়ে আছেন সামনের রাস্তার দিকে।

সোম রূপশ্রীর তাকিয়ে থাকাটা কীভাবে যেন অনুভব করলেন। শব্দ করে গলা পরিষ্কার করে বললেন, 'ও. কে.—আমিই বলছি।' ঘাড় ঘুরিয়ে রূপরেখার দিকে তাকালেন: 'শোন, রুপি...ব্যাপারটা বেশ ইন্টারেস্টিং। তুই কি কখনও ওয়্যারউলফের কথা শুনেছিস বা পড়েছিস?'

'ওয়্যারউলফ? হোয়াট ইজ দ্যাট? তোমাদের মুখে তো কখনও এই পিকিউলিয়ার ওয়ার্ডটা শুনিনি!'

'শুনিসনি বিকজ তোর সামনে আমরা কখনও ওয়্যারউলফের টপিকটা ডিসকাস করিনি। তবে একটু পরেই করতাম, বিকজ টুডে ইজ আ স্পেশাল ডে।' কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকার পর সোম বললেন, 'ওয়্যারউলফ—মানে, মানুষ- নেকড়ে...অথবা নেকড়ে-মানুষ।'

'নেকড়ে-মানুষ!' রূপরেখার গলায় ভয় আর বিস্ময়।

'তুই ফর নাথিং ভয় পাচ্ছিস, রুপি—।' মেয়ের ভয় কমাতে আশ্বাস দিলেন রূপশ্রী, 'ব্যাপারটা খুব সিম্পল। কোনও-কোনও মানুষ এক-একসময় নেকড়েতে পালটে যায়। মানে, হাফ অ্যানিম্যাল, হাফ ম্যান। যাকে বলে ওয়্যারউলফ। এই ওয়্যারউলফরা ভীষণ হিংস্র হয়, ওদের গায়ে অসম্ভব শক্তি।'

'কিন্তু হঠাৎ করে কোনও-কোনও মানুষ এরকম পালটে যায় কেন?' রূপরেখা অবাক হয়ে জানতে চাইল এবার।

বাইরে বৃষ্টির চেহারা একইরকম। তবে বৃষ্টি-ভেজা রাস্তার দু'পাশে এখন শুধুই গাছপালা আর জঙ্গল। কোনও লোকজন চোখে পড়ার কোনও প্রশ্নই নেই।

মেয়ের প্রশ্নের উত্তর দিলেন সোমরঞ্জন, 'কেন যে এমন ট্রান্সফরমেশান হয় সেটা এখনও কেউ জানে না। সায়েন্টিস্টরা এখনও এই প্রশ্নের উত্তর হাতড়ে বেড়াচ্ছে। তবে অনেকের ধারণা, ব্যাপারটা জিনের সঙ্গে রিলেটেড এবং এটা এক ধরনের অসুখ।

'একটা সময় ছিল, যখন এই টাইপের অসুস্থ মানুষরা পূর্ণিমার রাতে ওয়্যারউলফের চেহারায় পালটে যেত। কিন্তু পরে দেখা গেছে, পূর্ণিমার রাতের এই নিয়মের বাইরেও কোনও-কোনও মানুষ নেকড়ে-মানুষে পালটে যাচ্ছে। কেউ পূর্ণিমার বদলে অমাবস্যার চক্র মেনে চলছে। কেউ বা নিজের ইচ্ছেয় চেহারা পালটাতে পারছে। কেউ আবার নেকড়ে-মানুষের বদলে অন্য চেহারা নিতে পারছে। আসলে পুরো ব্যাপারটাই জিনের ম্যাজিক। এ-জিন কিন্তু আলাদিনের প্রদীপের জিন নয়—এ-জিন হল আমাদের শরীরের ভেতরের ব্যাপার—মানে, বংশাণু, বুঝলি?'

'কী এক্সাইটিং, ড্যাড!' অবাক হওয়ার আনন্দ-উত্তেজনা রূপরেখাকে ছুঁয়ে ফেলেছেঃ 'আচ্ছা, একটা ওয়্যারউলফ যখন নরমাল থাকে তখন তাকে দেখে কি বোঝা যায় যে সে, আই মিন, একজন মানুষ যদি আসলে ওয়্যারউলফ হয়, তা হলে তাকে দেখে সেটা বোঝার কি কোনও ওয়ে আছে?'

'ব্যাপারটা এত সিম্পল নয়, রুপি।' মম এবার কথা বলল, 'বিকজ ওয়্যারউলফ অনেক রকমের হয়। যেমন, ফুল মুন ওয়্যারউলফ, নিউ মুন ওয়্যারউলফ, শেপ শিফটার, সাইকললেস ওয়্যারউলফ—আরও অনেক-রকম। আমরা যতদূর জানি, নিউ মুন ওয়্যারউলফ ছাড়া আর কোনও টাইপের ওয়্যারউলফকে চিনে ফেলার কোনও উপায় নেই...।'

'নিউ মুন ওয়্যারউলফকে চেনা যায়!' অবাক হয়ে বলল রূপরেখা, 'বাট হাউ? কীভাবে চেনা যায়, মম?'

রূপশ্রী একবার তাকালেন সোমরঞ্জনের দিকে। আজ রুপির জন্মদিন। বিকেল থেকে ওঁরা তিনজন কত না আনন্দ করেছেন! সুখিয়ানা নদীর তীরে 'ড্রিমল্যান্ড' থিম পার্কে গেছেন। সেখানে মনের সুখে বোটিং করেছেন। সমুদ্রের নকল ঢেউয়ে লাফালাফি করে স্নান করেছেন। হরেকরকম রঙিন ফুল আর গাছ দিয়ে সাজানো চোখভোলানো মনভোলানো বনানীতে অসংখ্য রঙিন পাখপাখালির ফটো তুলেছেন। সেখানে ছুটোছুটিও করেছেন তিনজনে। ওঁদের বয়েস যেন দশবছর করে কমে গিয়েছিল। তারপর শুরু হয়েছিল ঝিরঝিরে বৃষ্টি। কিন্তু বৃষ্টির তোয়াক্কা না করেই ওঁরা আনন্দ করেছেন। রূপরেখাকে খুশি দেখে ওঁদের খুশি অনেক বেড়ে গেছে। সন্ধের পর 'ড্রিমল্যান্ড'-এর পশ রেস্তোরাঁয় আর্লি ডিনার সেরে তারপর গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছেন। এবং ইচ্ছে করেই এই অ-নিরাপদ রাস্তা ধরে ওঁরা এখন চলেছেন। কারণ, আঠারো পেরোলেই রূপরেখা হিসেব মতো বড় হয়ে যাবে। তখন ওর ভয়ের একটু মুখোমুখি হওয়া দরকার, ভয়ের সঙ্গে মোকাবিলা হওয়া দরকার। ভাগ্যিস ওই রোড সাইনটা দেখে রুপি নিজেই ইস্যুটা তুলল। না তুললে রূপশ্রী অথবা সোমরঞ্জন অবশ্যই তুলতেন।

'মম, কী হল? টেল মি, কী করে নিউ মুন ওয়্যারউলফকে চেনা যায়—।'

'আমি বলছি।' সোমরঞ্জন রূপশ্রীর অস্বস্তি যেন সূক্ষ্ম বেতার তরঙ্গে টের পেলেন। সামনে সোজা রাস্তা—কোনও বাঁক চোখে পড়ছে না। শুধু চোখে পড়ছে আকাশ থেকে ওপরওয়ালার ছিটিয়ে দেওয়া শান্তির জল, আর দু'পাশের গাছপালা। আর কখনও-কখনও রাস্তার ধারে পার্ক করে রাখা একটা কি দুটো গাড়ি।

'শোন বলছি—' ঘাড় ঘুরিয়ে রূপরেখার দিকে একবার দেখলেন সোমঃ 'নিউ মুন ওয়্যারউলফদের হাতের আঙুল একটু পিকিউলিয়ার টাইপের হয়। ওদের দু-হাতের অনামিকা—মানে, রিং ফিঙ্গার—মধ্যমার সমান কিংবা তার চেয়ে একটু বড় হয়। তবে কেন যে এটা হয় সেটা এখনও কেউ জানে না...।'

'মধ্যমা মানে? কোন ফিঙ্গারটা?' রুপি জানতে চাইল।

'মিডল ফিঙ্গার—।'

রূপরেখা চুপ করে গেল।

'অবাক হোস না, রুপি—' সোমরঞ্জন হেসে বললেন, 'এসবই জিনের ম্যাজিক। জিনের প্যাটার্ন—মানে, স্ট্রাকচারের মধ্যেই সেই ম্যাজিক লুকিয়ে আছে। কেউ-কেউ ব্যাপারটাকে একটা অসুখ বলে মনে করে। তাই জিন থেরাপি দিয়ে ট্রিটমেন্টের চেষ্টা করে। কিন্তু তাতে সমাধান কিছু পাওয়া গেছে বলে শুনিনি...।'

'তোমরা ওয়্যারউলফ নিয়ে এত কথা জানলে কেমন করে?'

'আমি আর তোর মম এই টপিকটা নিয়ে একটু-আধটু স্টাডি করেছি—স্রেফ নিজেদের ইন্টারেস্টে। সায়েন্টিস্টরা অবশ্য এখনও বলে, এই ওয়্যারউলফে পালটে যাওয়ার ব্যাপারটা পুরোপুরি একটা ইলিউশান। একটা সাইকোলজিক্যাল ট্রান্সফরমেশান। বাট বেশিরভাগ মানুষই এই থিয়োরিটা মেনে নেয়নি। তারা মনে করে, লাইক্যানথ্রপি—মানে, এই পালটে যাওয়ার ব্যাপারটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট রিয়্যাল। আমাদেরও সেই একই ধারণা। যাকগে— যে-কারণে তোকে নেকড়ে-মানুষ—আই মিন, মানুষ-নেকড়ে নিয়ে এত কথা বলা...সেটা হচ্ছে ওই সাইনবোর্ড। বিপজ্জনক রাস্তা, সাবধানে গাড়ি চালান।

‘রুপি, এই যে দু’পাশের গাছপালা আর জঙ্গল দেখছিস, এটা হচ্ছে ওয়্যারউলফদের প্রিয় এলাকা। এখানে এসে ওরা মনের সুখে শিকার ধরে। এই জঙ্গল ওদের হ্যাপি হান্টিং গ্রাউন্ড। সেইজন্যেই এই রাস্তা দিয়ে সাবধানে গাড়ি চালাতে হয়। এ-রাস্তায় খুব একটা কেউ আসে না...।’

‘তা হলে আমরা এলাম কেন?’ প্রশ্নটা করার সময় রূপরেখার ভুরু কুঁচকে গেল।

‘তোকে সাহসী করে তোলার জন্যে—’ রূপশ্রী মেয়ের প্রশ্নের জবাব দিলেন, ‘তুমি আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আঠেরো প্লাস হবে। তুমি একটা মোমেন্টেই অ্যাডাল্ট হয়ে যাবে। তোমাকে সেই মোমেন্ট থেকে অ্যাডাল্ট হিসেবে সবকিছুর মোকাবিলা করতে হবে। সেই সঙ্গে ভয়েরও। তখন চট করে ভয় পেলে কিন্তু চলবে না...।’

মমের কথা পুরোপুরি শেষ হওয়ার আগেই রূপশ্রী দেখল, দূরে রাস্তার ধারে নীল রঙের একটা ছোট গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে। গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা লোক। লোকটা বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে মাথার ওপরে দু-হাত তুলে নাড়ছে—গাড়ি থামাতে ইশারা করছে।

‘ড্যাড, গাড়ি থামাবে না কিন্তু...।’

‘কেন রে?’ সোমরঞ্জন মেয়ের দিকে আড়চোখে তাকানোর চেষ্টা করে হাসলেন, ‘নিশ্চয়ই ভদ্রলোকের গাড়িটা বিগড়ে গেছে...। তার ওপর এই বৃষ্টি...!’

‘আননোন লোকদের লিফট দিতে গিয়ে কত ছিনতাই, ডাকাতি আর মার্ডার হয় নিউজপেপারে পড় না! ডোন্ট স্টপ, ড্যাড!’

‘রুপি, তুই ফর নাথিং ভয় পাচ্ছিস।’ রূপশ্রী এবার মেয়ের দিকে মুখ ফিরিয়ে কথা বললেন, ‘আজ যদি আমাদের গাড়িটাই মাঝ-রাস্তায় খারাপ হত তা হলে আমরা কি লিফট চাইতাম না, হেলপ চাইতাম না, বল?’ তারপর স্বামীর দিকে তাকালেন: ‘সোম, আমাদের হেলপ করা উচিত...।’

‘নিশ্চয়ই! এরকম বিপদে পড়ে একজন হেলপ চাইছে...।’

সোমরঞ্জনের গাড়ির গতি কমতে শুরু করল। বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটা ক্রমশ ওঁদের কাছে চলে আসতে লাগল। তারপর একসময় থামল।

লোকটা বেশ লম্বা। ছ’ফুট কেন, তার বেশিও হতে পারে। হয়তো সেইজন্যেই সামান্য কুঁজো হয়ে গেছে। গায়ে শ্যাওলা রঙের একটা বর্ষাতি। মাথায় সাদা রঙের একটা ছোট ক্যাপ—বেশ শক্ত হয়ে এঁটে বসেছে।

গাড়ি থামতেই লোকটা ব্যস্তভাবে গাড়ির পিছনের দরজার কাছে চলে এল।

‘রুপি, দরজাটা খুলে দে...।’ রূপশ্রী বললেন।

রূপরেখার ভীষণ রাগ হচ্ছিল। ড্যাড আর মম যেন হঠাৎ করে দয়ার অবতার হয়ে উঠল। এই রাতে বৃষ্টির মধ্যে এই শুনসান রাস্তায় অচেনা-অজানা উটকো একটা পাবলিককে হুট করে গাড়িতে তুলে নিল!

লোকটা মাথার টুপিটা খুলে বর্ষাতির পকেটে ঢোকাল। রূপরেখা দরজা খুলতেই সে চট করে বর্ষাতিটা খুলে ফেলল। অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় সেটা কার্পেটের মতো রোল করে গুটিয়ে ছোট করে ফেলল, ছুড়ে দিল গাড়ির মেঝেতে। তারপর তিন সেকেন্ডের মধ্যে উঠে বসল রূপরেখার পাশে, এবং দরজা বন্ধ করে দিল।

কোনও কারণ ছাড়াই রূপরেখা ওর দিকের দরজার কাছে আরও সরে গেল।

লোকটা বলল, ‘মেনি থ্যাংকস।’ রূপকথার দিকে তাকিয়ে নড করল। তারপর সোমরঞ্জনকে লক্ষ করে বলল, ‘ভাগ্যিস আপনি গাড়ি থামালেন! নইলে এই বিচ্ছিরি ওয়েদারে কতক্ষণ সাফার করতাম কে জানে!...আমার নাম বিজয়েশ। সফটওয়্যারে আছি। অ্যাবাকাস স্কোয়ারে আমি নেমে যাব। আজ অ্যাডভেঞ্চারে বেরিয়ে এই ট্রাবল। এখন এই সিচুয়েশান থেকে উদ্ধার পেলে হয়!’

বিজয়েশ। নামটা তো অদ্ভুত! রূপরেখা ভাবছিল। ও একইসঙ্গে বিজয়েশকে লক্ষ করছিল।

লম্বাটে মুখ। কপালটা বেশ বড় হয়ে মাথার টাকে মিশে গেছে। তবে সেই টাক মাথার আধাআধি পর্যন্ত। তারপরই দিব্যি চুল রয়েছে এবং সেই চুল লম্বা হয়ে প্রায় কাঁধ পর্যন্ত নেমে এসেছে।

অন্ধকারে বিজয়েশের মুখ ভালো করে দেখা যাচ্ছে না। গাড়ির ড্যাশবোর্ডের আবছা আলো ওর কপালে, গালে, নাকের ডগা আর থুতনিতে হালকা হাইলাইট তৈরি করেছে।

অস্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে, ওর বেশ পুরু গোঁফ রয়েছে। আন্দাজে মনে হচ্ছিল, ওর বয়েস পঁয়ত্রিশ কি চল্লিশ হবে। কিন্তু বয়েসের তুলনায় গলাটা বেশ ভরাট।

রূপরেখার বেশ অস্বস্তি হচ্ছিল। একইসঙ্গে বিরক্তও লাগছিল। বারবার করে বারণ করা সত্ত্বেও ড্যাড আর মম শুনল না। উটকো লোকটাকে সেই গাড়িতে তুলল!

বিজয়েশের গা থেকে একটা গন্ধ বেরোচ্ছিল। অন্তত রূপরেখার নাক সেইরকমই জানান দিচ্ছিল। গন্ধটা ঘামের নয়—একটু অন্যরকম।

সোমরঞ্জন বিজয়েশকে নিজেদের পরিচয় দিয়ে তারপর জিগ্যেস করলেন, 'এদিকে কোথায় এসেছিলেন?'

'আমার এক বন্ধুর সঙ্গে জাস্ট এমনি অ্যাডভেঞ্চারে বেরিয়েছিলাম। ওর খেয়াল চেপেছিল বলে এই নটোরিয়াস রাস্তাটায় ঢুকে পড়েছিলাম। তারপর...।' কথা বলতে-বলতে হঠাৎই থেমে গেল বিজয়েশ। বড়-বড় শ্বাস ফেলতে লাগল।

'না, না—আপনি টেনশান করবেন না। রিল্যাক্স করুন। অ্যাবাকাস স্কোয়্যার মানে এই জঙ্গল শেষ হওয়ার পর...ও আসতে অনেক দেরি আছে।' সোমরঞ্জন ওকে ভরসা দিলেন।

বিজয়েশ গাড়িতে ওঠার আগে ওর গাড়ির দিকে তাকিয়ে একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পেয়েছিল রূপরেখা। সেটা নিয়ে ও কোনও কথাই বলেনি। ভয়ে। সেই দৃশ্যটার কথা মনে করেই ও বিজয়েশকে ভয় পাচ্ছিল। ওকে বিশ্বাস করতে পারছিল না।

এখন ড্যাডের প্রশ্নের উত্তরে ও যা বলল সেটাও তো অসম্পূর্ণ অস্পষ্ট!

রূপরেখা বিজয়েশের গাড়ির জানলা দিয়ে দেখেছিল একটা ফরসা হাত। হাতটা স্টিয়ারিং-এর ওপরে এলিয়ে আছে। সে-হাতে লেগে আছে রক্তের ছোপ।

রূপরেখার মনে হয়েছে, বিজয়েশের বন্ধু সামনের সিটে এমনভাবে পড়ে আছে যে, তাকে জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে না। শুধু ডানহাতটা স্টিয়ারিং-এর ওপরে এলিয়ে থাকায় রূপরেখার চোখে পড়েছে। তার মানে...তার মানে...।

'তারপর কী হল?' রূপশ্রী বিজয়েশকে কথার খেই ধরিয়ে দিলেন।

'তারপর যেটা হল সেটা এত আনএক্সপেক্টেড, এত সাডেন যে, কী বলব! আমার বন্ধু মোহন গাড়ি চালাচ্ছিল। ওরই গাড়ি। হঠাৎ ও বুকে ব্যথা বলে স্টিয়ারিং-এর ওপরে ঝুঁকে পড়ল। কোনওরকমে গাড়িটা সাইড করল। তারপর কাত হয়ে পড়ল। দেখলাম, ওর মুখ দিয়ে বেশ খানিকটা ব্লিডিং হয়েছে। সেরিব্রাল অ্যাটাক হয়েছে বলে মনে হল। তাড়াতাড়ি ওকে যে একটা নার্সিংহোম-টোমে নিয়ে যাব সেটাও পসিবল নয়। বিকজ আমি গাড়ি চালাতে জানি না। তখন কী করব ভেবে না পেয়ে ওকে কোনওরকমে আধশোয়া করে গাড়ি থেকে নেমে এসেছি। মোহনের দিকের দরজা খুলে ওর পালস-টালস চেক করেছি। না, কোনও ধুকপুকুনি নেই। সব শেষ। ওর বাড়ির ফোন-নাম্বার আমার কাছে নেই। তাই আমাদের দুজন কমন ফ্রেন্ডকে ফোন করলাম। ওরা মোহনের বাড়ি, পুলিশ, অ্যাম্বুলেন্স—এসব জায়গায় ফোন-টোন করছে, সব ব্যবস্থা করছে। আমাকে বলল, মোহনের বডি গাড়িতে লক করে রেখে চটপট বাড়ি ফিরতে। ওরা আমার জন্যে আমার বাড়িতে ওয়েট করবে। তারপর সবাই মিলে যা করার করব...।' কথা বলতে-বলতে বিজয়েশ বড়-বড় শ্বাস নিচ্ছিল আবার।

ওর গল্পের মাঝে-মাঝে ড্যাড আর মম 'হুঁ', 'হ্যাঁ', 'তারপর' ইত্যাদি বলছিল, কিন্তু রূপরেখা চুপ করে বিজয়েশের কথা শুনছিল। ওর মনে হচ্ছিল, গল্পটার মধ্যে কোথায় যেন একটা গরমিল রয়েছে।

'তাই আমি বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে লিফট পাওয়ার চেষ্টা করছিলাম। রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে বেশ ভয়ও করছিল। কারণটা তো আপনারা নিশ্চয়ই জানেন! এই জঙ্গলে ভীষণ নেকড়ে-মানুষের উৎপাত। নেকড়ে-

মানুষ—মানে, ওয়্যারউলফ। দু-দুটো গাড়ি আমাকে পেরিয়ে চলে গেল। আমার ইশারায় একটুও পাত্তা দিল না। তারপর...তারপর আমার গুডলাক যে আপনারা দাঁড়ালেন। সিরিয়াসলি বলছি, এই রাস্তায় একা-একা দাঁড়িয়ে থাকতে বেশ ভয় করছিল। ওয়্যারউলফরা যেরকম ফেরোশাস হয়...।'

বিজয়েশ ভয় পাওয়ার কথা বলছিল বটে কিন্তু ওর কথাবার্তায় ভয় পাওয়ার ব্যাপারটা মোটেই ফুটে উঠছিল না। বিজয়েশ যত যা-ই বলুক না কেন, রূপরেখার মনে সন্দেহের কাঁটাটা একঘেয়েভাবে খচখচ করছিল। অথচ ড্যাড আর মমকে দ্যাখো! অচেনা লোকটার সঙ্গে এমনভাবে গল্প জুড়ে দিয়েছে যেন কতদিনের চেনা! তার ওপর ড্যাড আবার হাসতে-হাসতে বলে বসেছে, 'আপনাকে একটা গুড নিউজ দিই, বিজয়েশ। আর ঠিক...' হাতঘড়ির দিকে তাকাল ড্যাড: 'আর ঠিক বাইশ মিনিট পরই একটা ঘটনা ঘটবে এই গাড়ির ভেতরে—কিন্তু আপনি সেই ঘটনাটা দেখতেও পাবেন না, শুনতেও পাবেন না...।'

'সে আবার কীরকম ঘটনা!' অবাক হয়ে বলে উঠল বিজয়েশ।

সোমরঞ্জন আবার হাতঘড়ি দেখে বললেন, 'আর ঠিক সাড়ে একুশ মিনিট পর আমার মেয়ে রূপরেখা ওর আঠেরো বছর কমপ্লিট করে আঠেরো প্লাস হবে। আজ ওর জন্মদিন—।'

'ও, তাই নাকি! ভেরি গুড!' রূপরেখার দিকে তাকাল বিজয়েশ: 'হ্যাপি বার্থডে, রূপরেখা। কনগ্র্যাচুলেশানস!'

রূপরেখার মাথায় দুষ্টুবুদ্ধি খেলে গেল। ও হ্যান্ডশেখ করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিল বিজয়েশের দিকে। বিজয়েশ একটু ইতস্তত করে হাত মেলাল। কুণ্ঠিতভাবে বলল, 'সরি, কোনও গিফট দিতে পারলাম না...।'

রুপি হেসে বলল, 'গিফটের কোনও দরকার নেই—উইশটাই আসল।'

আধো-অন্ধকারে যতটা পেরেছে বিজয়েশের হাতটা ততটাই অনুভব করার চেষ্টা করেছে রূপরেখা। অনামিকার দৈর্ঘ্যটা বুঝতে চেয়েছে। ওটা মধ্যমার সমান, না কি বড়?

না, সেটা বুঝতে পারা যায়নি। তার আগেই হাত ছাড়িয়ে নিয়েছে বিজয়েশ।

সামনের সিট থেকে রূপশ্রী বলে উঠলেন, 'রুপি ঠিক বলেছে, বিজয়েশ। গিফটের চেয়ে উইশটা অনেক বড়। তা ছাড়া...' হাসলেন রূপশ্রী: 'বলতে গেলে আপনার প্রেজেন্সটাই তো একটা গিফট! কী, বলুন?'

বিজয়েশ আমতা-আমতা করে বলল, 'দারুণ বলেছেন, ম্যাডাম।'

'হ্যাঁ—সত্যি এটা দারুণ বলেছ, রূপশ্রী।' সোমরঞ্জন হেসে তারিফ করলেন।

রূপরেখা ওর সাইডব্যাগটা পাশেই সিটের ওপরে রেখেছিল। এখন ব্যাগ হাতড়ে ওর মোবাইল ফোনটা বের করে নিল। বোতাম টেপাটিপি করতে-করতে বিজয়েশকে লক্ষ করে বলল, 'আপনার একটা ট্রিট পাওনা রইল। বিকজ এরকম একটা দিনে আপনি আমাদের মাঝে এসে পড়েছেন।' কথা বলতে-বলতে ও মোবাইল ফোনের আলোয় বিজয়েশের আঙুল দেখতে চেষ্টা করল। কিন্তু কপাল খারাপ। বিজয়েশের ডান হাতটা মুঠো করে সিটের ওপরে রাখা। আর বাঁ-হাতটা ওর শরীরের ওপাশে—দেখা যাচ্ছে না।

রূপরেখার কথার খেই ধরে রূপশ্রী বলে উঠলেন, 'খুব ভালো বলেছ, রুপি। আমাদের দুজনেরই উচিত ছিল আগেই বিজয়েশবাবুকে নেমন্তন্ন করা।' কথাটা বলে সোমরঞ্জনের দিকে তাকালেন রূপশ্রী: 'কী, ঠিক বলিনি?'

'অফ কোর্স ঠিক বলেছ। ও. কে., বিজয়েশ। আমি আর ''বাবু-টাবু'' বলছি না। স্ট্রেট ''তুমি'' করে বলছি। আমাদের বাড়িতে তোমার নেমন্তন্ন রইল। এনি ডে অফ ইয়োর চয়েস। জাস্ট দু-দিন আগে একটা ফোন করে জানিয়ে দেবে যে, তুমি আসছ। রুপি তোমাকে ওর ফোন নাম্বার দিয়ে দিচ্ছে...।'

'আপনার মোবাইল নাম্বারটা বলুন, আমি একবার রিং বাজিয়ে দিচ্ছি—।'

বিজয়েশ ওর মোবাইল নম্বর বলল, একটু পরেই জলতরঙ্গের মিষ্টি সুর বেজে উঠল। দু'বার বেজে থেমে গেল।

'আপনি যেদিন আসবেন, বলবেন—আমাদের বাড়ির ডায়রেকশনের ডিটেইলস আপনাকে দিয়ে দেব।' রূপরেখা বলল।

বিজয়েশ 'ঠিক আছে' বলে পকেট থেকে মোবাইল বের করে নিল। রূপরেখার নম্বরটা সেভ করল। কিন্তু তখনও ওর আঙুলের ডগা দেখা গেল না।

হঠাৎই সোমরঞ্জন গাড়ির স্পিড কমালেন। গতিজাড্যের জন্য রূপরেখা আর বিজয়েশ দুজনেই ঝুঁকে পড়ল সামনের দিকে। দূরে, হেডলাইটের এলাকার শেষ প্রান্তে, একটা প্রাণী রাস্তার ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বেশ লম্বা চেহারা। এতটাই লম্বা যে সামনের দিকে ঝুঁকে বেশ খানিকটা কুঁজো হয়ে রয়েছে। সারা গায়ে লোম। হাত দুটো সামনে ঝুলছে। হাতের প্রান্তে লম্বা-লম্বা আঙুল। আঙুলের ডগায় নখ হয়তো আছে, কিন্তু মলিন আলো আর বৃষ্টির ঝালর নজর ঝাপসা করে দিয়েছে।

'ওয়্যারউলফ!' চাপা গলায় বলল রূপরেখা।

'হ্যাঁ—।' শান্তভাবে বললেন রূপশ্রী, 'এটা ওদের এলাকা...।'

সোমরঞ্জন জঙ্গলের পাশ ঘেঁষে গাড়ি দাঁড় করিয়ে দিলেন।

অদ্ভুত প্রাণীটা নেকড়ের মতো ক্ষিপ্র দু-তিন লাফে ডানদিকের জঙ্গলে ঢুকে গেল।

'নিন, স্যার, এবার গাড়িতে স্টার্ট দিন...। ওটা চলে গেছে...।' বিজয়েশ চাপা গলায় বলল।

সোমরঞ্জন শান্ত গলায় বললেন, 'না, বিজয়েশ—গাড়িটা এখন বেশ কিছুক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে থাকবে। এইমাত্র রূপরেখা এইটিন প্লাস হল। আমরা চারজনে এই মোমেন্টটাকে সেলিব্রেট করব...।'

বিজয়েশ অবাক হয়ে বলল, 'তার মানে!'

'বলছি—বুঝিয়ে বলছি...।' সোমরঞ্জন অনেকটা ঘুরে বসলেন নিজের সিটে। যাতে বিজয়েশের সঙ্গে কথা বলতে সুবিধে হয়। এপাশ-ওপাশ তাকালেন। কাচের বাইরে বৃষ্টি আর জঙ্গলকে দেখলেন। তারপর: 'বিজয়েশ, তোমাকে আগে মাছরাঙার ব্যাপারটা বলি। হয়তো তুমি জানো...তবুও...।'

রূপরেখা বেশ উশখুশ করছিল। মাথা ঝাঁকাচ্ছিল বারবার।

রূপশ্রী জানতে চাইলেন, 'কী হল, রুপি?'

'শরীরের ভেতরটা কেমন করছে, মম। ফিলিং আনইজি...।'

'মাছরাঙা পাখি পুকুর, ঝিল কিংবা নদীর কাছে গাছের ডালে ধৈর্য ধরে চুপটি করে বসে থাকে। জলের সারফেসে মাছ নড়তে দেখলেই সাঁ করে উড়ে গিয়ে ছোঁ মেরে সেটাকে তুলে নেয়। ওদের ঠোঁটে করাতের মতো দাঁত কাটা থাকে। তাই ওদের কাছ থেকে শিকার কখনও ছিটকে পালাতে পারে না।

'অথচ এই মাছরাঙাকে যদি কখনও জ্যান্ত তিড়িংবিড়িং মাছ সামনে ধরে দাও সে সেটা ছুঁয়েও দেখবে না। ওর অভ্যেস ছোঁ মেরে নদী অথবা পুকুরের জল থেকে মাছ শিকার করা।' একটু চুপ করে থেকে তারপর: 'ওয়্যারউলফদেরও ঠিক তাই। ওরা শিকারি...মাছরাঙার মতো...।'

'ড্যাড!' অদ্ভুত কর্কশ গলায় ডেকে উঠল রূপরেখা। ওর মুখের চামড়ায় টান ধরছিল। হাতের আঙুলগুলো কী একটা অদ্ভুত ম্যাজিকে লম্বা হয়ে যাচ্ছিল। নিজের ওপরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছিল ও।

'বয়েস আঠেরো প্লাস হওয়ামাত্রই আমাদের ওয়্যারউলফদের একটা রূপান্তর ঘটে যায়। সেটার ওপরে কারও কন্ট্রোল থাকে না।' সোমরঞ্জন তখনও বলে যাচ্ছিলেন, 'সবই জিনের ম্যাজিক। যে-ম্যাজিকের মিস্ট্রি আজও কেউ এক্সপ্লেইন করতে পারেনি...।'

রূপরেখার গলা দিয়ে একটা হিংস্র গর্জন বেরিয়ে এল। ওর চোখ এখন নেকড়ের মতো হলদে-সবুজ, ধকধক করে জ্বলছে। গায়ের চামড়ায় গজিয়ে উঠেছে গোছা-গোছা কালো লোম।

ও ভাঙা-ভাঙা কর্কশ গলায় বলে উঠল, 'ড্যাড, মম! হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং টু মি? কী হচ্ছে এসব?'

'ভয় পেয়ো না, রুপিসোনা। আমরা সাইকললেস ওয়্যারউলফ। আমাদের প্রথম ট্রান্সফরমেশান হয় এইটিন প্লাস বয়েস হওয়ামাত্রই। এর ওপরে কারও কোনও কন্ট্রোল থাকে না। তারপরই তোমার কাজ হল শিকার

ধরা—মাছরাঙার মতো। সো, বিজয়েশ, এক্ষুনি তুমি দরজা খুলে পালাও—প্রাণপণে ছুটে পালাও। যাতে রুপি তোমাকে তাড়া করে শিকার করতে পারে...। রান! রান! রান!' চিৎকার করে বললেন সোমরঞ্জন।

বিজয়েশের গলা শুকিয়ে কাঠ। ও এক ঝটকায় গাড়ির দরজা খুলে ভেজা রাস্তায় নেমে পড়ল। কিন্তু তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। তারপর কোনওরকমে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ছুট লাগাল জঙ্গলের দিকে। ভিজে গাছপালা আর সবুজ পাতার ঝাঁক বিজয়েশকে যেন গিলে ফেলল।

রক্ত হিম করা এক হিংস্র গর্জন করে একটা নেকড়ে-মানুষ গাড়ির পিছনের দরজা ঠেলে লাফিয়ে এল বাইরে। প্রাণীটার ধাক্কায় দরজা খুলে পড়ে গেল রাস্তায়। শরীরটা মাপে বড় হয়ে যাওয়ায় পরনের পোশাক ছিঁড়ে কয়েক ফালি হয়ে গা থেকে ঝুলছে। মেঘলা আকাশের দিকে মুখ তুলে হাঁ করে একটা লম্বা চিৎকার করল। তারপর দুটো ভয়ংকর লাফ মেরে ঢুকে পড়ল জঙ্গলে।

বিজয়েশের গন্ধ এখনও ওর নাকে লেগে আছে। ওকে শিকার করে ধারালো নখে চিরে ফালাফালা না করা পর্যন্ত ওয়্যারউলফ ধর্মে ওর দীক্ষা সম্পূর্ণ হবে না।

ততক্ষণ রূপশ্রী আর সোমরঞ্জন জঙ্গলের কিনারায় দাঁড়িয়ে মেয়ের জন্য অপেক্ষা করবেন। নিজেদের দীক্ষা নেওয়ার রাতগুলো ওঁদের মনে পড়ে যাচ্ছিল।

বাড়িটায় কেউ যেয়ো না

জন্মদিন এমনিতেই বেশ ভালো ব্যাপার। কিন্তু তার সঙ্গে যদি ক্রিসমাসের বড়দিন জুড়ে যায় তা হলে তো ব্যাপক হইহই মাইন্ড ব্লোয়িং ফ্যান্টাস্টিক কাণ্ড। ঠিক সেটাই প্রত্যেক বছর হয় মধুমিতার জন্মদিনে। ওকে মা-বাবা থেকে শুরু করে ফ্রেন্ড সার্কলের সবাই বলে, 'মিতা, তুই খুব লাকি—।'

এতে লাকের কী আছে মধুমিতা জানে না, তবে এই পঁচিশে ডিসেম্বর জন্মদিন হওয়াটা ওর বেশ ভালো লাগে। এর সবচেয়ে বড় কারণ, ওর সবচেয়ে ক্লোজ তিনজন বন্ধু —মুনমুন, অভিলাষ আর আর্য—জন্মদিন কাম বড়দিন মানাতে সকাল দশটা-সাড়ে দশটাতেই এসে হাজির হয়।

এবারের জন্মদিনেও তার হেরফের হয়নি। ওরা এসেছে গিফট নিয়ে। তারপর মধুমিতার ঘরে বসে চারজনে মিলে চলছে হা-হা হি-হি, আড্ডা, কেক, চা-কফি, আর নানারকম স্ন্যাকস। কোনও কিছুর দরকার হলেই মধুমিতা অভ্যেস মতো হাঁক পাড়ছে, 'মাম, একবার এদিকে এসো—।'

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ঘরের দরজায় ওর মা এসে হাজির। তখন মধুমিতা খুচরো ফরমাস ছুড়ে দেয়। সেটা শুনে মা ঠোঁটে হেসে চলে যান। মেয়েটা মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে চলল তবুও ছোটবেলার অভ্যেস গেল না। এক জায়গায় স্ট্যাচু হয়ে বসে শুধু ফরমাস আর ফরমাস!

সকাল থেকে আকাশে ছাই রঙের মেঘ। সূর্যকে লেপ চাপা দিয়ে দিয়েছে। ফলে শীতটা স্কোয়ার কি কিউব হয়ে গেছে। তার মধ্যেই মাঝে-মাঝে ঝিরঝিরে বৃষ্টি। এরপর কখন যে জোরে শুরু হবে কে জানে!

পরমেশ্বর—মানে, মধুমিতার 'পমেশমামা'—এক টিপ জোয়ান মুখে দিয়ে চোখ বুজে চিবোতে-চিবোতে বললেন, 'শোন মিতা, পৃথিবীর সব জায়গাতেই এমন দু-একটা বাড়ি খুঁজে পাওয়া যাবে যেগুলোতে কেউ থাকে না। আর কেউ কখনও ওসব বাড়িতে যায়ও না....।'

'হন্টেড হাউস?' মধুমিতা জানতে চাইল।

'ঠিক তেমন নয়—' পমেশমামার চোয়াল নড়ছিল: 'তবে হন্টেড হতেও পারে, আবার নাও হতে পারে। কিন্তু কেউ সেখানে যায় না। মানে, ভয় পায়। অথচ বাড়িগুলো খুব ইন্টারেস্টিং।'

ছোটবেলায় মধুমিতা 'পরমেশ্বরমামা' শব্দটা উচ্চারণ করতে গিয়ে 'পমেশমামা' বলত। সেই থেকে 'পরমেশ্বর' 'পমেশ' হয়ে গেছে।

জানলার বাইরে শীতের মেঘলা দুপুর। তার সঙ্গে ঝিরঝিরে বৃষ্টি। কিন্তু মেঘ-বৃষ্টিকে পাত্তা না দিয়ে সকাল থেকেই মধুমিতাদের গল্প-টল্প চলছিল। সেইসব গল্পের মধ্যে ফেসবুক, ফেসবুকে আপলোড করা ফোটো, স্কুলের স্যার আর ম্যামদের ক্যারিকেচার—এসবের চর্চাই ছিল বেশি। দেওয়ালে ঝোলানো ঘড়ির কাঁটা তার নিজের খেয়ালে ঘুরে চলেছিল। ঘুরতে-ঘুরতে বেশ খানিকটা বেলার দিকে পরমেশ্বরমামা এসে হাজির হলেন।

'কই রে, মিতা? কোথায় তুই?' বাজখাঁই গলায় হাঁক পাড়তে-পাড়তে পমেশমামা ঢুকে পড়লেন মধুমিতাদের ঘরে। হাতে গিফটের প্যাকেট।

পরমেশ্বর রেলে চাকরি করেন। ফলে তাঁকে মাঝে-মাঝে বদলি হতে হয়। এখন আছেন ধানবাদে। সময়-সুযোগ পেলে মধুমিতার জন্মদিনটায় এসে হাজিরা দেন। যেমন, এবারে এসে পড়েছেন।

গিফটের প্যাকেট না খুলেই মধুমিতা বুঝতে পারল ওর ভেতরে কী আছে। বই। কারণ, পরমেশ্বর গিফট বলতে বই ছাড়া কিছু বোঝেন না।

প্যাকেট খুলতেই বেরোল ভূতুড়ে বাড়ি নিয়ে লেখা কয়েকটা বাংলা আর ইংরেজি বই।

ভূত আর ভূতুড়ে ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে পমেশমামার ইন্টারেস্ট মধুমিতার ভালো করেই জানা। সুযোগ পেলেই সেসব নিয়ে গল্প ফেঁদে বসেন। মামা সবসময় সেগুলো ‘সত্য ঘটনা’ বলেই পেশ করেন, কিন্তু মধুমিতার সে নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সন্দেহ থাক আর না-ই থাক, ‘সত্য ঘটনা’-গুলো ও শুনতে ছাড়ে না।

ঘোর দুপুরে খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে আবার শুরু হল গল্প। তবে এবার গল্পের বিষয় ‘ভূতুড়ে বাড়ি’। পমেশমামা একটা চেয়ারে গা এলিয়ে বসেছেন। পাশের টেবিলে ছোট কাচের বাটিতে জোয়ান রাখা আছে। ভালো-মন্দ খাওয়া-দাওয়ার পর পমেশমামা বেশ কয়েক টিপ জোয়ান খাওয়া পছন্দ করেন।

বিছানায় এদিক-ওদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে ছিল মধুমিতারা চারজন। আর্যরূপ, অভিলাষ আর মুনমুন একটু অবাক চোখে মধুমিতার পমেশমামাকে দেখছিল।

বেঁটে গোলগাল চেহারা। মাথায় টাক। চোখে চশমা। নাকের নীচে মোটাসোটা গোঁফ। বাইরে-বাইরে চাকরি করে গায়ের রং রোদে পোড়া।

পমেশমামার গিফটের বইগুলো আর্যরা হাতে-হাতে নিয়ে দেখছিল। আর নিজেদের মধ্যে ভূতুড়ে বাড়ি নিয়ে কথাবার্তা বলছিল।

তখনই পরমেশ্বর এক টিপ জোয়ান মুখে দিয়ে চোখ বুজে চিবোতে-চিবোতে বললেন, ‘শোন মিতা, পৃথিবীর সব জায়গাতেই...।’

আর্যরূপ বলল, ‘আঙ্কল, একটা কথা বলছি—কিছু মাইন্ড করবেন না। ভূত ব্যাপারটাকে কিছুতেই লজিক দিয়ে দাঁড় করানো যায় না—কেউ তো এখনও পারেনি। তা হলে আপনিই বলুন, ভূতুড়ে, মানে, হন্টেড ব্যাপারটা লজিকের ওপরে দাঁড়াবে কেমন করে?’

আর্যরূপ বড় হয়ে সায়েন্টিস্ট হতে চায়। তাই সবসময় ‘লজিক-লজিক’ করে। সেজন্য মধুমিতার মাঝে-মাঝে বিরক্ত লাগে।

পমেশমামা হেসে বললেন, ‘দ্যাখো আর্য, আমিও সবসময় লজিক আঁকড়ে চলতে ভালোবাসি। কিন্তু যখন সব লজিকই হাত তুলে দেয় তখন কী করব বলো তো! তখন তো শূন্যে ভাসতে থাকি। সে বড় গোলমেলে ব্যাপার...।’

অভিলাষ হাঁ করে পমেশমামার কথাবার্তা শুনছিল। ওর ফরসা মুখে কেমন একটা কবি-কবি ভাব। ওর টানা-টানা চোখের দিকে তাকালে মনে হয়, ও যেন একটা ঘোরের জগতে আছে।

ও জিগ্যেস করল, ‘এরকম সিচুয়েশানে কখনও পড়েছেন নাকি, আঙ্কল?’

পরমেশ্বর ওর চোখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। মনে হল যেন দোটানায় পড়ে ভাবছেন। তারপর জানলা দিয়ে বাইরে তাকালেন। ঝিরঝিরে বৃষ্টির ঝালরের দিকে আনমনাভাবে চেয়ে রইলেন।

অনেকক্ষণ পর বললেন, ‘হন্টেড ব্যাপারটা আমি লাইফে দু-চারবার দেখেছি। তবে তার মধ্যে একটা সিচুয়েশান সবচেয়ে সিরিয়াস ছিল। ব্যাপারটা আমার গায়ে দুটো পারমানেন্ট চিহ্ন রেখে গেছে...।’

মামার মুখে এরকম কথা মিতা আগে কখনও শোনেনি। তাই ও অবাক হয়ে পমেশমামার দিকে তাকাল।

‘না, এ ব্যাপারটা তোকেও কখনও বলিনি। ইন ফ্যাক্ট, কাউকেই বলিনি—।’ হাফ শার্টের বাঁ হাতাটা ওপর দিকে তুলে ধরলেন পরমেশ্বর। চোখে পড়ল ইঞ্চি-তিনেক লম্বা একটা বীভৎস ক্ষতের দাগ। দাগটা বেশ চওড়া আর ক্ষতটা সেরে গেলেও সেখানে মাংস এবড়ো-খেবড়ো হয়ে আছে।

‘এটা হল একটা চিহ্ন—’ জামার হাতাটা টেনে নামিয়ে ঠিকঠাক করে পরমেশ্বর বললেন, ‘আর-একটা পারমানেন্ট চিহ্ন আছে আমার পিঠে। পিঠের ডানদিকে অনেকটা জায়গা পুড়ে গিয়েছিল। আমাকে নার্সিংহোমে বারোদিন থাকতে হয়েছিল। চোটটা খুব সিরিয়াস ছিল...।’

মধুমিতা আবদারের গলায় বলল, ‘পমেশমামা, প্লিজ, এই স্টোরিটা আজ আমাদের চারজনকে শুনিয়ে দাও—।’

‘স্টোরি নয় রে—’ একটু হেসে পরমেশ্বর বললেন, ‘একেবারে সত্যি ঘটনা। রিয়েল হন্টিং-এর কেস।’ জানলা দিয়ে আবার তাকালেন বাইরে। কিন্তু কিছু দেখেও যেন দেখছিলেন না। বোধহয় ধীরে-ধীরে পিছিয়ে যাচ্ছিলেন সেই ঘটনার সময়ে।

মিতারা চারজন চুপ করে চেয়ে রইল পরমেশ্বরের মুখের দিকে।

খুব বেশিদিন আগের কথা নয়। বছর কুড়ি হবে। তখন আমার মাথায় টাক ছিল না। আমি সেসময়ে বিহারের রাখিতপুরে পোস্টেড। এখন অবশ্য জায়গাটা ঝাড়খণ্ডে পড়ে। ধানবাদ জংশন থেকে বালিয়াপুর হীরক রোড ধরে গাড়িতে গেলে রাখিতপুর মিনিট পঁয়ত্রিশের রাস্তা।

ছোট্ট স্টেশন। একটাই প্ল্যাটফর্ম। সারাদিনে চারটে কি পাঁচটা গাড়ি দাঁড়ায়। সুতরাং, বুঝতেই পারছ—কাজ-টাজ বেশ কমই ছিল। সেসময়ে রাখিতপুরে স্টেশন- মাস্টারের কোনও কোয়ার্টার ছিল না। কাছাকাছি একটা ছোট্ট গ্রাম ছিল—দুসরা। সেখানে যাদবদের বস্তিতে আমি একটা ঘরভাড়া পেয়ে গিয়েছিলাম। সেখানেই থাকতাম। নানান জনের খেতের শাকসব্জি সস্তায় পেতাম, পাতকুয়োর জল তুলে সেসব দু-বেলা রান্না করতাম। তার সঙ্গে রুটি আর অড়হড় ডাল বানিয়ে দিব্যি খেতাম। আর ফাঁকা সময় পেলে আমার বাড়িওয়ালা মহাবীর যাদবের সঙ্গে গল্প করতাম।

এ ছাড়া মাঝে-মাঝে উত্তরদিকের মাঠ পেরিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে রাখিতপুরের সীমানা ছাড়িয়ে ‘দাওয়াই টাউন’-এর দিকে চলে যেতাম। সেদিকে একটা জঙ্গলও ছিল। রাখিতপুরের মানুষজন সেখানে কাঠের সন্ধানে যেত। আর জঙ্গলের নেশা আমাকে যে টানত তার কারণ ছিল ফুল আর পাখি। যেসব ফুল আর পাখি সেখানে দেখতাম তাদের একটারও আমি নাম জানতাম না। কিন্তু ওদের রংচং আর মিষ্টি ডাক আমার মনে নেশা ধরিয়ে দিত।

আমার গল্পটা সেই ‘দাওয়াই টাউন’-কে নিয়ে।

‘দাওয়াই টাউন’-এর কথা আমি প্রথম শুনি মহাবীর যাদবের কাছে। একদিন রাতে বস্তিতে গানবাজনার মেহফিল বসেছিল। সপ্তাহে একটা দিন—শনিবার বা রোববার—হ্যাজাক লণ্ঠনের আলো জ্বেলে এরকম গানবাজনার আসর বসে। সেইসঙ্গে চাঁদা তুলে চাপাটি, ভুজিয়া, লিট্টি অথবা খিচুড়ি আর আলুভাজার ব্যবস্থা করা হয়। গানের সঙ্গে-সঙ্গে খাওয়াদাওয়া চলে।

সেইরকম এক গানবাজনার আসরে একদিন একটা অল্পবয়েসি ছেলেকে গান গাইতে দেখলাম। ছেলেটার গানের গলা বেশ ভালো। কিন্তু আমার চোখ টানল ওর গালের একটা লম্বা কাটা দাগ। দাগটা বাঁ-গালে রগের কাছ থেকে শুরু হয়ে গাল বেয়ে একেবারে গলা পর্যন্ত নেমে গেছে। দাগটা এমন যে, দেখলে যে-কেউ শিউরে উঠবে।

আমারও একই অবস্থা হয়েছিল। হ্যাজাকের আলোয় দাগটা প্রথম চোখে পড়তে আমি রীতিমতো আঁতকে উঠেছিলাম। মনে হচ্ছিল, ছেলেটার গালে কেউ নিষ্ঠুরভাবে তরোয়াল চালিয়ে দিয়েছে।

আমি মহাবীরজীকে চাপা গলায় বলেছিলাম, ‘ওই ছেলেটা কে? ওর গালের ওই কাটা দাগটা দেখেছেন!’

‘হ্যাঁ—দেখেছি। লাস্ট এক সাল ধরেই দেখছি।’ মহাবীরজী সুপুরি চিবোচ্ছিলেন। তার সঙ্গে সুগন্ধী কিছু বোধহয় মেশানো ছিল। নেশা ধরানো বেশ একটা মিষ্টি গন্ধ বেরোচ্ছিল। জমিতে থুতু ফেলে তিনি বললেন, ‘ওর নাম মোহন। ‘‘দাওয়াই টাউন’’-এ ঢুকে ওর এই হাল হয়েছে...।’

‘‘‘দাওয়াই টাউন’’ মানে?’

‘‘‘দাওয়াই টাউন’’-এর কাহানি আপনাকে পরে শোনাব। ওখানে জিন আছে। ওখানে কারও না যাওয়াটাই ভালো। আমি তো সববাইকে মানা করি। আপনি রাখিতপুরে নতুন আছেন। কথা যখন উঠল তখন আপনাকে ভি বলে দিই : ওই এরিয়ায় আপনি কখনও যাবেন না—।’

‘কিন্তু, মহাবীরজী, জায়গাটা তো আমি চিনিই না! তা হলে যাওয়ার প্রশ্ন উঠছে কোত্থেকে?’ এ-ধরনের সাবধানবাণী শুনে আমার বেশ অবাকই লাগছিল। তা ছাড়া ভূত-প্রেত-এ বিশ্বাস আমার কোনও কালেই ছিল না। তবে বরাবরই আমার কৌতূহল একটু বেশি।

‘চেনেন না, ঠিক আছে। কিন্তু যদি কখনও পথ ভুলে বেখেয়ালে চলে যান—তাই বলছি। অবশ্য ওখানে ওয়ার্নিং লাগানো আছে...।’

‘তা ‘‘দাওয়াই টাউন’’-এ ঢুকে মোহনের গাল কাটল কেমন করে?’

‘জানি না। কেউই জানে না। কারণ, মোহন কাউকে বলেনি। জিগ্যেস করলে দুঃখ করে শুধু বলে, ‘‘ছোড়িয়ে ভাইয়া—মেরা নসিব...।’’’

এর কিছুদিন পর মহাবীর যাদবের কাছ থেকে আমি ‘দাওয়াই টাউন’-এর কাহিনি শুনেছি।

প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগে রাখিতপুরের সীমানায় গরিবদের জন্যে একটা হাসপাতাল তৈরির বন্দোবস্ত করা হয়। একটা মাইনিং কোম্পানি নাকি গভর্নমেন্টের সাপোর্ট নিয়ে এটা তৈরি করতে নেমে পড়েছিল। তাতে কন্ডিশান ছিল, কোনও গ্রামে হাসপাতাল তৈরি করলে তবেই পাওয়া যাবে সরকারি ভর্তুকির টাকা।

প্রায় দশ বিঘে জায়গা খুঁটি দিয়ে বাঁশ দিয়ে ঘেরা হল। তার মাঝামাঝি জায়গায় ছ’তলা হাসপাতাল বিল্ডিং তৈরি হল। আর বিল্ডিং-এর আশেপাশে বেশ কয়েকটা টিনের চালার ঘরও তৈরি করা হয়েছিল। স্টাফদের কোয়ার্টার।

খুব কম পয়সায় চিকিৎসা করা যাবে বলে এলাকায় হ্যান্ডমাইক নিয়ে ভ্যান-রিকশা করে পাবলিসিটি করা হয়েছিল। মহাবীর যাদব এসব শুনেছে তার বাবার কাছে। সেসময়ে দুসরা গ্রামে একটা ছোটখাটো হাসপাতাল পাওয়া মানে ছিল হাতে স্বর্গ পাওয়া। সে-সুবিধে তো হলই, তার সঙ্গে বোনাস পাওয়ার মতো লোকাল ছ’-সাতজন লোকের চাকরিও হয়ে গেল সেখানে।

হাসপাতালটার নাম দেওয়া হয়েছিল ‘জনতা সেবাকেন্দ্র’। চিকিৎসার ব্যবস্থা সেখানে যে খুব ভালো লেভেলের ছিল তা নয়—বরং বলা যায় চলনসই, মামুলি। তবু কিছু না থাকার চেয়ে তো ভালো!

লোকাল লোকের কাছে ‘জনতা সেবাকেন্দ্র’-এর লোকাল নাম হয়ে গেল ‘দাওয়াই টাউন’। ব্যস, তারপর থেকে শান্ত গ্রামে সবকিছু ঠিকঠাক চলতে লাগল।

এমনি করে বছর দুয়েক চলার পরই গোলমালটা হল। একটা আজব ঘটনা ঘটে গেল ওই হাসপাতালে। তারপর থেকে ওটার গায়ে ‘অভিশপ্ত’, ‘ভূতুড়ে’—এইসব দাগ লেগে গেল।

প্রথমদিন মহাবীরজী ‘দাওয়াই টাউন’-এর পুরো গল্প আমাকে শোনাননি। সুপুরি চিবোতে-চিবোতে কাশির দমক আসায় বারকয়েক কাশলেন। তারপর কাশি সামলে হলদে ছোপ ধরা দাঁত বের করে হাসলেন: ‘চলুন—একদিন আপনাকে জায়গাটা চিনিয়ে দিই। তারপর ওই জিনিয়া টাউনের আশেপাশে বসে মউজ করে বাকি কাহানিটা আপনাকে শোনানো যাবে...।’

তো তাই হল।

রবিবার দুপুর বারোটা সাতের পর রাখিতপুরে আর কোনও ট্রেন দাঁড়ায় না। তাই আমার বলতে গেলে সোয়া বারোটার পর ছুটি। নিজের সাপ্তাহিক কাজকর্ম সেই দিনটাতেই আমি সেরে নিই। তো সেইরকম এক রবিবারে দুপুর আড়াইটের সময় মহাবীর যাদব আমার আস্তানায় এসে হাজির। আমি তখন খাওয়া-দাওয়া সেরে তক্তপোশে বডি ফেলে একটু জিরোনোর পদক্ষেপ নিচ্ছি।

আমার নাম-ডাক শুনে বাইরে বেরিয়ে এলাম। দেখি মহাবীরজী দাঁড়িয়ে আছেন।

মাথায় কদমছাঁট কাঁচাপাকা চুল, ভাঙা গাল, মোটা গোঁফ। কিন্তু তার মধ্যেও চোখ দুটোয় সরলতা মাখানো। এবং মুখে হাসি।

মহাবীরজীর গায়ে হালকা নীলের ওপরে সাদা ডোরাকাটা একটা ফতুয়া, তার সঙ্গে সামান্য ময়লা হয়ে যাওয়া ধুতি। পায়ে চপ্পল। হাতে ছাতা। সে-ছাতার হ্যান্ডেল বেতের লাঠির তৈরি, মাথাটা বাঁকানো।

‘চলুন, মাস্টারজী—‘‘দাওয়াই টাউন’’ দেখবেন চলুন...।’

সঙ্গে-সঙ্গে বুকের ভেতরে একটা চাপা উত্তেজনা টের পেলাম।

দু-দিন ধরে আকাশে মেঘ-মেঘ। মাঝে-মাঝে অল্পস্বল্প বৃষ্টি। তাই আমিও তৈরি হয়ে ছাতা নিয়ে বেরোলাম। আমার ছাতাটা অবশ্য ভাঁজ করা যায়।

গাঁয়ের ছোট-ছোট ঘরগুলো পেরিয়ে আমরা চাষজমির এলাকায় এসে পড়লাম। এখানে-ওখানে কয়েকটা সাদা বক ওড়াউড়ি ঘোরাঘুরি করছে। জমি থেকে কীসব খুঁটে-খুঁটে খাচ্ছে। আলের ওপর দিয়ে সাবধানে হেঁটে দু-দুটো বড়-বড় খেত পেরিয়ে গেলাম। তারপরই বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে কলাবাগান। তার মধ্যে হেঁটে যাওয়ার সময় দুটো শেয়াল চোখে পড়ল। আমাদের দেখে ছুটে আড়ালে চলে গেল।

পথ চলতে-চলতে মহাবীর যাদব রাখিতপুরের নানান কথা বলছিলেন। বলছিলেন এখানকার মানুষেরা বেশিরভাগই খুব ভালো। তবে সবাই খুব অভাবী। অভাবের চোটে কেউ-কেউ অসৎ পথেও নেমে গেছে। রাতের আঁধারে এ-খেত ও-খেত থেকে চাষের ফসল চুরি করে। কখনও বা এর মুরগি ওর ছাগল লোপাট করে মাংস-টাংস খায়। সেইজন্যে এখানে দু-চারটে কলকারখানা হলে ভালো হয়। এলাকার জোয়ানগুলো সেখানে নোকরি-ওকরি পেতে পারে।

‘আমিও খোঁজখবর রাখছি—যদি কোনও বিজনেসম্যান এখানে টাকাপয়সা ইনভেস্ট করে কিছু একটা ছোটামোটা ইনডাস্ট্রি বানাতে চায়। সব জমিতে তো আর চাষবাস হয় না। যে-মাইনিং কোম্পানি এ-জমির মালিক তার ডিরেক্টরকে আমি চিনি। ধানবাদে ওনার বাড়ি। আমার সঙ্গে থোড়াবহত জানপহেচানভি আছে। দু-চারবার বাতচিত হয়েছে। যদি কেউ এ জমিন কেনার ব্যাপারে ইন্টারেস্ট দেখায় তো আমি কানেকশন করিয়ে দেব।’

কথা বলতে-বলতে আমরা পথ হাঁটছিলাম। বাতাস ভেজা। আকাশে মেঘ মাঝে-মাঝেই চাপা গরর-গরর শব্দ তুলছে। পায়ের নীচে ভেজা মাটি। আমি কলাগাছের ফাঁকফোকর দিয়ে দূরে নজর চালিয়ে দিচ্ছিলাম—যদি ‘দাওয়াই টাউন’-এর দু-এক চিলতে নজরে পড়ে। কিন্তু শুধুই গাছপালা চোখে পড়ছিল।

কলাবাগান শেষ হতেই এপাশে-ওপাশে কয়েকটা বড়-বড় পুকুর দেখতে পেলাম। তার মাঝখান দিয়ে পথ এগিয়ে গেছে।

মহাবীর যাদব জানালেন, এই পুকুরগুলোয় মাছ চাষ হয়। আবার সুখার সময়ে এইসব পুকুর থেকেই জল টেনে চাষজমিতে কাজে লাগানো হয়।

সামনে বাঁ-দিকটায় বেশ কয়েকটা ছোট-বড় গাছপালা চোখে পড়ছিল। সেদিকে আঙুল দেখিয়ে মহাবীরজী বললেন, ‘এসে গেছি। ওই যে, ওই গাছপালাগুলোর ওপাশেই ‘‘দাওয়াই টাউন’’। আপনাকে আমি শর্টকাট রাস্তা দিয়ে নিয়ে এলাম...।’

আর বড়জোর পাঁচ মিনিট কি সাত মিনিট লাগল। আমরা ‘দাওয়াই টাউন’-এর সামনে এসে পড়লাম।

‘জনতা সেবাকেন্দ্র’ যখন গড়ে ওঠে তখন তাকে ঘিরে একটা টাউনশিপ মতন তৈরি করার চেষ্টা হয়েছিল। প্ল্যান ছিল, ধীরে-ধীরে ব্যাপারটাকে ঠিকঠাক চেহারায় নিয়ে যাওয়া যাবে। তা হলে বেশ কিছু স্টাফ হাসপাতাল এলাকাতেই থাকতে পারবে। আর তাতে স্টাফদের ডিউটি করতে সুবিধে হবে। তা ওই টাউনশিপের ভাবনাটা এলাকার লোকজনের মুখে-মুখে ছড়িয়ে গিয়েছিল। আর সে থেকেই হয়তো ‘জনতা সেবাকেন্দ্র’-এর নাম ‘দাওয়াই টাউন’ হয়ে গিয়েছিল।

মহাবীর যাদব হাত তুলে ইশারা করে দেখালেন ‘দাওয়াই টাউন’-এর দিকে : ‘ওই যে...।’

মেঘলা আকাশের পটভূমিতে ‘দাওয়াই টাউন’-এর দিকে তাকিয়ে চাইনিজ ইঙ্ক আর জল মিশিয়ে হ্যান্ডমেড পেপারে আঁকা ওয়াশের ছবি বলে মনে হল। আর বিচিত্র সেই ছবিটা যেন অন্য একটা মায়াবী জগৎ থেকে তাকিয়ে রয়েছে আমার দিকে।

ছ'তলা হাসপাতাল বিল্ডিংটা ভাঙাচোরা রংচটা। সারা গায়ে পোড়া কালো-কালো দাগ। লম্বা-লম্বা ফাটল অজগর সাপের মতো এঁকেবেঁকে ছাদের দিক থেকে নেমে এসেছে নীচে। অথবা তার উলটোটাও হতে পারে।

ফাটলগুলোর নানান জায়গা থেকে বট-অশ্বত্থ ইত্যাদি গাছ দিব্যি বেড়ে উঠেছে। এ ছাড়া ছাদেও বেশ কয়েকটা উলটো-পালটা গাছ গজিয়ে গেছে। হঠাৎ দেখলে মনে হবে, ছাদে কেউ বাগানচর্চা করেছে।

বাড়িটায় অনেকগুলো জানলা—হাসপাতালে যেমনটা হয়। তবে সব জানলাই বন্ধ। ব্যতিক্রম হিসেবে বেশ কয়েকটা জানলার পাল্লা ভেঙে ঝুলছে—অথবা খসে পড়ে গেছে।

বাড়িটার কাছ থেকে বেশ খানিকটা দূরে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রয়েছে কয়েকটা টিনের চালার ঘর। তাদের চালগুলো সব জং ধরে খসে-খসে গেছে। কোথাও বা ইটের দেওয়াল হেলে পড়েছে। আর কোনও-কোনও দেওয়াল একেবারে ধসে গেছে—সময়ের চাপ সামলাতে পারেনি।

'দাওয়াই টাউন' এলাকাটা এককালে খাটো পাঁচিল দিয়ে ঘেরা ছিল, কিন্তু এখন সেই পাঁচিলের সেরকম কোনও অস্তিত্ব নেই। শুধু কোথাও-কোথাও দু-চার লাইন ইট পাঁচিলের স্মৃতিকথা হয়ে আছে।

'দাওয়াই টাউন'-এর পেছনে বড়-বড় গাছের জঙ্গল। মহাবীরজী বললেন, 'ও-জঙ্গলে শেয়াল, ভাম, নেকড়ে, বুনো কুকুর কিংবা চিতাবাঘ-টাঘও আছে বলে শুনেছি—কিন্তু আমি কখনও চোখে দেখিনি। গাঁয়ের লোক একটু রিসক নিয়েই ওখানে কাঠ-টাট কাটতে যায়...।'

আমি ছ'তলা বাড়িটাকে দেখছিলাম। কেমন যেন একটা থমথমে চুপচাপ ব্যাপার। শুধুমাত্র ভূতুড়ে বদনামের জন্যে এতবড় একটা জায়গা বেকার পড়ে-পড়ে নষ্ট হচ্ছে! ফ্যাক্টরি-ট্যাক্টরি না হোক, অন্তত চাষবাস করেও তো জমিটা থেকে দু-চার পয়সা আয় হত!

সে-কথাই মহাবীরজীকে বললাম।

মহাবীরজী মাথা নাড়লেন। পকেট থেকে ছোট ডিব্বা বের করে সুপুরির কুচি মুখে ফেললেন। তারপর: 'পমেশজী, পহেলে পুরা স্টোরি তো সুন লিজিয়ে...।'

'পরমেশ্বরজী' কথাটা উচ্চারণ করতে বেশ হোঁচট খেতে হয়। পরিচয়ের শুরু-শুরুতে মহাবীরজী নিজেই এ-কথা আমাকে বলেছেন। তাই মধুমিতার 'পমেশমামা'-র মতো উনি আমাকে 'পমেশজী' করে নিয়েছিলেন।

আমাকে হাত ধরে হালকা টান দিলেন। কাছেই একটা ভেঙে পড়া শুকনো গাছের গুঁড়ির খানিকটা অংশ কাত হয়ে পড়েছিল। বাকিটা লোকাল লোকজন কেটেকুটে নিয়ে গেছে। সেদিকে দেখিয়ে মহাবীর যাদব বললেন, 'চলুন—ওখানে গিয়ে একটু বসি...।'

তো আমরা সেখানে গিয়ে বসলাম। আমার চোখ বারবারই 'দাওয়াই টাউন'-এর দিকে চলে যাচ্ছিল।

'পমেশজী, আমাদের মহল্লায় দু-টাইপের লোক আছে। এক, যারা ভূত-জিন এসবে বিসোয়াস করে। আর একদল চোরি-ওরিতে বিসোয়াস করে। তাই অনেকে ''দাওয়াই টাউন''-কে ভয় পায়, ওটার কাছে যেতে চায় না। আবার কেউ-কেউ চোরি-ছুপে ওই হসপিটাল বিল্ডিং-এ ঢুকে পড়ে, কাঠের টেবিল, চেয়ার, লোহালক্কড়, মেশিনপত্তর যা পারে চুরি করে। তারপর সেগুলো বিক্রিবাটা করে পয়সা কামায়...।

'আমার আইডিয়া, মোহন যাদবও সেরকম কিছু একটা করতে গিয়েছিল। ওর সেরকম আদত আছে। তো সেই চোরি-ওরি করতে গিয়ে গালে-গলায় চোট পেয়ে এসেছে—।'

'ওরকম চোট কী করে হল? কে ওকে মারল?'

'সেটাই তো বুঝতে পারছি না—' মহাবীরজীর তামাটে কপালে কয়েকটা ভাঁজ পড়লঃ 'মোহনকে অনেকবার জিগ্যেস করেছি—কিন্তু ও ঝাড়াঝাপটা কোনও জবাব দেয়নি। ওই যে, সেদিন বললামঃ ''মেরা নসিব।'''

'আপনি কি ভূত, জিনে বিশ্বাস করেন?'

‘না—করি না। আমি চাই এলাকার তরক্কি। এলাকার উন্নতি হোক। যারা ওই হসপিটাল বিল্ডিং থেকে চুরিচামারি করে তারাই বেশি করে ভূত-জিনের কাহানি রটায়। যাতে ওদের কাম-কাজ শান্তিতে করতে পারে।’

মহাবীরজী কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর মাথার পেছনে হাত বোলাতে- বোলাতে বললেন, ‘তবে, পমেশজী...আমার মনে হয় একটা কোনও বেহিসেবি ব্যাপার ওই ‘‘দাওয়াই টাউন’’-এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে।’

‘কেন, এ-কথা মনে হয় কেন?’

আমি বুঝতে পারছিলাম, মহাবীরজী একটু দোটানায় ভুগছেন। কিন্তু কেন?

‘আট সাল আগে ‘‘দাওয়াই টাউন’’-এ দুটো মার্ডার হয়ে গিয়েছিল। ‘‘মার্ডার’’ বলছি বটে কিন্তু কোনও মার্ডারার ধরা পড়েনি। পুলিশ ওই জোড়া মার্ডারের কেস সলভ করতে পারেনি।

‘যারা মার্ডার হয়েছিল তারা আমাদের বাজুওয়ালা বস্তিতে থাকত। ছোকরু আর মুন্না। দুজনেরই উমর এই ধরুন আটাশ কি তিরিশ হবে। ওরা চোরি করে পেট ভরাত। হ্যাঁ, ওদের পেশাই ছিল চুরি করা। মহল্লার সবাই এটা জানত, কিন্তু কিছু বলত না। কারণ, ওরা নিজেদের বা আশপাশের এরিয়ায় কোনও চুরিচামারি করত না। কাম-কাজ সারতে দূর-দূর চলে যেত। আমাদের সবার আইডিয়া, মুন্না আর ছোকরু ওই হসপিটালে চোরি করতে ঘুসেছিল। সেখানে হয়তো আরও একটা গ্যাং চোরি করতে ঘুসেছিল। তারপর এনকাউন্টার। ব্যস—মুন্না আর ছোকরু মার্ডার হয়ে গেল।

‘হসপিটালের বাইরের জমিনে ওদের দুজনের ধুলোমাখা বডি পড়ে ছিল। কোনও ছুরি-টুরি বা ওই টাইপের কুছু দিয়ে মার্ডারার ওদের গলার নলি কেটে দিয়েছে।

‘পুলিশ যেটুকু ছানবিন আর ইনভেস্টিগেশান করেছিল তাতে এইটুকু আইডিয়া করতে পেরেছিল যে, ছোকরু আর মুন্নার গলায় রামপুরিয়া চালানো হয়েছে অস্পাতালের ভেতরে। ওরা গলায় হাত চেপে ছুটে বেরিয়ে এসেছে বাইরে। বেশিদূর যেতে পারেনি —পড়ে গেছে মাঠের ওপরে।

‘এরকম আইডিয়া করার কারণ, হসপিটালের ভেতরে লিফটের কাছে একটা জায়গায় অনেক রক্ত পড়ে ছিল, আর মাঠে যেখানে ওই চোর দুটোর বডি পাওয়া গিয়েছিল সেখানে সেরকম ব্লাড ছিল না। তা ছাড়া, ছোকরু আর মুন্নার ডানহাতে অনেক রক্ত লেগে ছিল। এর কারণ, পুলিশ বলেছে, ওরা বোধহয় গলায় হাত চেপে রক্ত আটকাতে কোশিশ করেছিল। শেষ পর্যন্ত আর পারেনি।

‘ছোকরু-মুন্নার মার্ডারার আর ধরা পড়েনি, পমেশজী। তাই ওই খুনের জিম্মেদারি ওই ভূতুড়ে অস্পাতালের ঘাড়েই চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। আসলে ঠিক কী হয়েছিল কেউ জানে না।’

মহাবীর যাদবের মুখে এসব কথা শুনতে-শুনতে আমি যেন একটা শেষ-নেই গর্তে তলিয়ে যাচ্ছিলাম। একটা অচেনা ভয় চাদরের মতো আমার গায়ে জড়িয়ে যাচ্ছিল। আমি মোহন, ছোকরু আর মুন্নার কথা ভাবছিলাম। ভাঙাচোরা ভূতুড়ে হসপিটালটার ভেতরে কি কোনও ভয়ংকর হিংস্র খুনি লুকিয়ে আছে? কিন্তু এত বছর ধরে লুকিয়ে থাকাটা কঠিন শুধু নয়—অসম্ভবও।

হসপিটালটার দিকে তাকালাম। মনে হল, পোড়া-পোড়া ফাটল ধরা ছ’তলা বাড়িটাকে ঘিরে যেন মেঘের হালকা আস্তর ভেসে বেড়াচ্ছে। পাখির মিষ্টি ডাক শোনা যাচ্ছিল, কিন্তু মেঘলা দিনের সেই মিষ্টি ডাককে আমার কু-ডাক বলে মনে হল। সেই ডাক যেন বারবার বলছে, ‘বাড়িটায় কেউ যেয়ো না। বাড়িটায় কেউ যেয়ো না...।’

টাউনের এলাকাটা যেখানে শুরু সেখানে একটা সাইনবোর্ডের মতো লাগানো আছে দেখলাম।

মহাবীরজী বললেন, ‘আপনাকে যে বলেছিলাম ওয়ার্নিং লাগানো আছে—ওটাই সেই ওয়ার্নিং। সরপঞ্চ লাগানোর ব্যবস্থা করেছে। ওতে পাবলিককে হুঁশিয়ারি দেওয়া আছে।’

আমি গাছের গুঁড়ির সিট ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। কেমন একটা ঘোরের মধ্যে হসপিটাল-বাড়িটার দিকে চেয়ে রইলাম। আমি আগে কখনও কোনও হন্টেড হাউস —মানে, ভূতুড়ে বাড়ি—দেখিনি। তবে এটা মনে হল, যে-ছ'তলা বাড়িটা এত পুরোনো, বছরের পর বছর এত অবহেলায় পড়ে আছে, সেটার 'ভূতুড়ে' হওয়ার অধিকার নিশ্চয়ই আছে। আর সেটাই আমার দেখা প্রথম ভূতুড়ে বাড়ি। যদিও তখনও সেটার ভূতুড়ে চরিত্র টের পাইনি। টের পাওয়ার পর বহুবার মনে হয়েছে, টের না পেলেই ছিল ভালো।

পায়ে-পায়ে 'দাওয়াই টাউন'-এর সীমানার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। তোবড়ানো রং-চটা সাইনবোর্ডটা দুটো বাঁশের খুঁটিতে পেরেক ঠুকে আঁটা। জায়গায়-জায়গায় লেখার রং উঠে গেলেও সেটা পড়তে কোনও অসুবিধে হচ্ছে না। ইংরেজি এবং হিন্দিতে লাল রঙে লেখা সাবধানবাণী :

ডু নট এন্টার
অন্দর মাত যাইয়ে

আমি বাড়িটাকে অনুভব করতে চাইছিলাম। অলৌকিক কিছু কি সত্যি-সত্যিই আছে ওই বাড়িটায়? যদি থাকে, তা হলে সেই ব্যাপারটা শুরু হল কেমন করে? কেউ কি মারা গেছে ওই হসপিটালে?

কিন্তু হসপিটালে চিকিৎসা করাতে গিয়ে কোনও-কোনও রোগী মারা যেতেই পারে। ব্যাপারটা ব্যাড লাক হলেও বাস্তব। তা হলে কি কেউ অপঘাতে মারা গেছে ওখানে?

ফিরে আসার জন্যে ঘুরে দাঁড়াতেই মহাবীর যাদবের মুখোমুখি হয়ে গেলাম। উনি কখন যে গাছের গুঁড়ি ছেড়ে আমার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন টেরই পাইনি।

মহাবীরজী আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। বোধহয় আমার মনের ভেতরটা পড়ে নিতে চাইছিলেন।

আমি জিগ্যেস করলাম, 'হঠাৎ করে হসপিটালটা ভূতিয়াঘর হয়ে গেল কেমন করে? সেই কাহানিটা তো বললেন না?'

মহাবীরজী ঠোঁটে হাসলেন—মেঘলা আকাশের মতন হাসি। ভিজে মাটির দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর ছাতার ডগাটা মাটিতে ঠুকলেন কয়েকবার। বোঝাই যাচ্ছিল, তিনি কিছু একটা ভাবছেন। হয়তো ভাবছেন, হসপিটালটার ভূতিয়াঘর হয়ে ওঠার কাহিনি আমাকে বলবেন কি বলবেন না।

আকাশের মেঘ কখন যেন আরও ঘন হয়েছে। হসপিটালের মাথায় এখন শ্যামলা রঙের ছাতা। মেঘের গলাখাঁকারি শোনা গেল। কয়েকটা পাখি ডেকে উঠল কোথাও।

'বলব—সবই বলব।' মহাবীর যাদব আবেগমাখা চোখে তাকালেন আমার দিকেঃ 'আর আমি না বললেও ভি আপনি জানতে পারবেন। মহল্লার কেউ না কেউ তো আপনাকে বলবে! তবে এখন—এই অস্পাতালের সামনে দাঁড়িয়ে সেই কাহানি বলতে ভালো লাগছে না। পরে বলব। এখন শুধু এটুকু শুনে রাখুন, ওই হাসপাতালে একটা হাদসা হয়েছিল, আমাদের গাঁয়ের প্রাইমারি ইস্কুলের সাতাশটা বাচ্চা-বাচ্চা ছেলে-মেয়ে মারা গিয়েছিল।' কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন মহাবীরজী। হাসপাতালটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। ওঁর চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছিল। আমি ওঁর বিষণ্ণ মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

অনেকক্ষণ পর মানুষটা মুখ খুললেন, 'পমেশজী, ওই সাতাশটা বাচ্চার মধ্যে আমার বহেন লছমিও ছিল। সেইজন্যেই আমি ভূতিয়াঘরের ভূত-পিরেতকে খতম করে এই টাউনের বদনাম হঠাতে চাই। সেটাই হবে আমার ছোটি বহেনকে ছিনিয়ে নেওয়ার বদলা। তাই আমি চাই এই ''দাওয়াই টাউন''-এ কোনও ফ্যাক্টরি-উক্টরি হোক...।'

আমি চুপ করে মানুষটাকে দেখতে লাগলাম। কল্পনায় দেখতে পেলাম, একটা বাচ্চা মেয়ে, টাউনের মাঠে ছুটোছুটি করে খেলছে। তার গায়ে স্কুলের ইউনিফর্ম। মাথার পিছনে একজোড়া ছোট্ট বিনুনি। তার ডগায়

লাল ফিতের ফুল।

লছমির ঠিক কী হয়েছিল এই হসপিটালে?

মহাবীরজী আমাকে বললেন, 'চলুন, মাস্টারজী—ওয়াপস চলতে হ্যায়। এখুনি বারিশ এসে যেতে পারে...।'

আর কোনও কথা না বলে আমরা ফেরার পথ ধরলাম।

কয়েক পা এগোতে না এগোতেই আমাদের ছাতা খুলতে হল।

এর দিন চার-পাঁচ পরেই মোহন যাদবের সঙ্গে আমার বেশ আলাপ হয়ে গেল। দিনটা ছিল শুক্রবার। বেলা এগারোটা হলেও আকাশ মেঘলা থাকায় সময়টা ভোরবেলা বলে মনে হচ্ছিল।

আমি প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ছিলাম। মেঘলা আলো গায়ে এসে পড়ছিল। বেলা বাড়লেও আলো তেমন বাড়েনি। চারপাশে কেমন একটা মিঠে ব্যাপার ছড়িয়ে আছে।

এই স্টেশনে একটাই প্ল্যাটফর্ম—তাও আবার কাঁচা, ইটের লাইনিং দিয়ে বাঁধানো। প্ল্যাটফর্মে বেশ কয়েকটা বড়-বড় গাছ। তাদের ছায়ার দৌলতে প্ল্যাটফর্মের মানুষজন একটু ছায়া-টায়া পায়।

স্টেশনের গা ঘেঁষে একটা সরু খাল। তার দু'পাশে সবুজ গাছপালা। সেখানে সবসময়েই এ-পাখি সে-পাখি ওড়ে। আমি প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে সবুজ আর পাখি দেখছিলাম। তখনই মোহনকে নজরে পড়ল।

কেঁচোর মতো নেতানো স্পিডের একটা প্যাসেঞ্জার ট্রেন সোম-বুধ-শুক্র আমার স্টেশন হয়ে ধানবাদের দিকে যায়। বোধহয় সেই ট্রেনটা ধরার জন্যেই মোহন যাদব একটা ময়লা থলে হাতে ঝুলিয়ে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে।

আমিই এগিয়ে গিয়ে গায়ে পড়ে ওর সঙ্গে আলাপ জমালাম।

মোহন দু-চারজন ছেলের সঙ্গে গল্প করছিল। গায়ে নীল আর সবুজে ছাপা একটা হাওয়াই শার্ট। পায়ে ময়লা খাকি প্যান্ট। গলায় কালো কারের মালা—তাতে ঝুলছে একটা মাদুলি। মাদুলিটা দেখতে ছোটখাটো ঢোলের মতো।

মোহনের তামাটে রং, ছোট-ছোট চোখ, মাথায় লম্বা চুল। এক কানে একটা রুপোর মাকড়ি। আর গায়ে উৎকট ঘামের গন্ধ।

'মোহন, আমি এই ইস্টিশানের মাস্টারজী। তোমাদের বস্তিতে মহাবীরজীর ঘরে ভাড়া থাকি। আমার নাম পমেশ চৌধুরী...।'

একটা আলতো নমস্কারে ও আমার নমস্কার ফিরিয়ে দিল। বলল, 'হাঁ, মালুম হ্যায়—।'

আমি মোহনের বাঁ-গালের কাটা দাগটার দিকে তাকিয়ে ছিলাম। মোহন আড়চোখে সেটা লক্ষ করছিল।

আমি অস্বস্তিতে চোখ সরিয়ে নিলাম। ইতস্তত করে বললাম, 'তোমার সঙ্গে একটু কথা ছিল। মানে...।'

'কী কথা?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল মোহন যাদব।

আমি সাততাড়াতাড়ি একটা লাগসই জবাব খুঁজতে লাগলাম। 'দাওয়াই টাউন'-এর ব্যাপারটার তত্ত্বতালাশ করতে চাইলে আগে মোহন যাদবের মুখ খোলানো দরকার।

'তোমার গানের গলা বিউটিফুল—।'

এ-কথায় কাজ হল। মোহনের মুখে লাজুক ভাব ফুটে উঠল।

আমি বললাম, 'কলকাতার একটা ফাংশানে গান গাওয়ার ডাক পেলে তুমি যাবে?'

মোহনের মুখে আগ্রহ মেশানো একটা মোলায়েম ভাব ছড়িয়ে পড়ল।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ—জরুর যাব, মাস্টারজী।'

না, মোহনকে আমি ঠকাব না। সত্যি-সত্যিই কলকাতায় আমাদের পাড়ার ক্লাবের অ্যানুয়াল ফাংশানে ওকে গান গাওয়ার ব্যবস্থা করে দেব। ওর গানের গলা সত্যিই চমকে যাওয়ার মতো।

'হ্যাঁ—সেটা নিয়েই তোমার সঙ্গে একটু কথা বলব। এখন তো হবে না—তুমি তো ট্রেন ধরবে...।'

'হাঁ, মাস্টারজী। আমার পিতাজীর জন্যে টাউন থেকে দাওয়াই নিয়ে আসতে যাচ্ছি। আমার পিতাজী গ্যাসট্রিকের খুব শকত পিসেন্ট। ট্রিটমেন্টের অনেক খরচা।' পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছল মোহন। তারপর নীচু গলায় বলল, 'আমি তো বিকেলের মধ্যে ওয়াপস চলে আসব। তারপর আপনার ঘরে গিয়ে বাতচিত করতে পারি....।'

আমি বললাম, 'সেই ভালো। তবে আজ নয়—কাল। তুমি কাল সন্ধেবেলা সাড়ে ছ'টা কি সাতটায় আমার ঘরে এসো। এসব নিয়ে কাউকে কিছু এখন বোলো না—।'

মোহন অনেকখানি ঘাড় কাত করল। বলল, 'না, কাউকে কুছু বলব না...।'

কাল ওকে আসতে বললাম, কারণ, রোববার সন্ধেটা আমি নিজের পছন্দের বইপত্র নিয়ে পড়াশোনার মধ্যে থাকি।

এমন সময় দূরে দেখা গেল ট্রেন আসছে। তার হুইসলের শব্দ বাতাসে কেঁপে-কেঁপে কাছে এগিয়ে আসছে। ছোটবেলা থেকে এই শব্দটা আমার দারুণ প্রিয়। শুধু এই শব্দটা শোনার জন্যেই আমি বাড়ির কাছাকাছি রেল-স্টেশনে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতাম। মনে হত, এই মায়াবী শব্দটার পিঠে চড়ে আমি বহুদূর চলে যেতে পারি।

বড় হয়ে ওঠার পরেও এই অলৌকিক টানটা এতটুকুও বদলায়নি। সেইজন্যেই রাখিতপুরের একঘেয়ে জীবনেও আমার হাঁপ ধরেনি।

মোহন যাদব ট্রেনে উঠে চলে গেল। ওর এক সঙ্গী দরজার কাছে দাঁড়িয়ে খইনি চাপড়াতে লাগল।

ট্রেনটা ধীরে-ধীরে ছোট হয়ে যাচ্ছিল। তার কালো ধোঁয়া ক্রমেই ফিকে হয়ে আসছে।

আমি আনমনা হয়ে সেসব দেখছিলাম। হঠাৎই পেছন থেকে কে যেন ডেকে উঠলঃ 'পমেশজী...।'

আমি চমকে ঘুরে তাকালাম।

মহাবীর যাদব।

আজ ওঁর মুখে সেই বিষণ্ণ ভাব নেই। বরং মানুষটাকে অল্পবিস্তর খুশি-খুশি বলেই মনে হল।

'মোহনের সঙ্গে বাতচিত করছিলেন? গাল-গলার ওই জখমি দাগ নিয়ে?'

আমি হেসে বললাম যে, ওই কাটা দাগ নিয়ে আমার যথেষ্ট কৌতূহল থাকলেও ওকে সে নিয়ে কিছু জিগ্যেস করিনি। বরং কলকাতায় আমাদের ক্লাবের ফাংশানে ও গান গাইতে রাজি আছে কি না সে-কথাই জানতে চাইছিলাম। ও রাজি আছে। আমি সামনের মাসে কলকাতায় যাব—তখন কথাবার্তা বলে সব ফাইনাল করে আসব। তা উনি অসময়ে স্টেশনে এসেছেন কেন?

মহাবীর যাদব বললেন, 'আপনার সঙ্গে একটু কথা ছিল, মাস্টারজী।'

'চলুন—আমার ঘরে চলুন—।'

'আমার ঘর' বলতে পাকা দেওয়াল, টিনের ছাউনি, একটা টেবিল, দুটো চেয়ার আর একটা লম্বা বেঞ্চি। রাখিতপুর টাইপের স্টেশনে স্টেশন মাস্টারের যেরকম টাইপের ঘর হওয়া স্বাভাবিক সেইরকম।

মহাবীর বললেন, 'না, না, তার দরকার নেই। একজনের সঙ্গে আপনার কথা করাব। ওই ''দাওয়াই টাউন''-এর ব্যাপারে। ভদ্রলোক খুব রইস আদমি। মিস্টার মিসরা। কুমারডুবিতে ওনাদের মেডিসিন ফ্যাক্টরি আছে। তো মিসরাসাহেব ওই ''দাওয়াই টাউন''-এ কিছু একটা করতে চান। লেকিন...।'

'লেকিন কী?'

'মাস্টারজী, মিসরাসাহেব স্টেশনের বাইরে গাড়িতে আছেন। আপনি যদি বাইরে এসে ওনার সঙ্গে একটু বাতচিত করেন তো ভালো হয়। এখন তো আর টিরেন-উরেন কিছু নেই....।'

আমি অবাক হয়ে গেলাম। এর মধ্যে আবার আমি কেন!

সে-কথাই মহাবীরকে বললাম।

'দেখুন, আমি এখানে নতুন লোক। আগে-পিছে কিছুই জানি না। আপনারা লোকাল লোক—কথাবার্তা যা বলার আপনারাই বলুন। আমাকে আর এর মধ্যে জড়াবেন না...।'

'জড়াতাম না, পমেশজী। কিন্তু আমরা অনপঢ় গাঁওয়ার, আর আপনি লিখাপড়া জানা কোয়ালিফাই আদমি। তাই আমি চাই মিসরাজীর সঙ্গে কথা করার সময় আপনি থাকবেন। চিন্তা করবেন না—আমি আমাদের মুখিয়ার সঙ্গে কথা করে এ ব্যাপারে পারমিসশান নিয়ে নিয়েছি। এবার তো চলুন! মিসরাসাহেব অনেকক্ষণ ওয়েট করছেন...।'

এরপর আর ওজর-আপত্তি চলে না। অগত্যা মহাবীরজীর সঙ্গে হাঁটা দিলাম স্টেশনের বাইরে।

স্টেশনের বাইরেটা সাধারণত যেমন জমজমাট হয় এখানে ততটা নয়। তবে বেশ কয়েকটা খাবারের দোকান আর চায়ের স্টল আছে। এছাড়া ট্রেনের সময় ধরে দু-একটা ভ্যান-রিকশাও পাওয়া যায়।

মহাবীরজীর সঙ্গে স্টেশনের বাইরে এলাম। আসার পথে তিনি বললেন, 'মোহনের থেকে আপনিই কথা বের করতে পারবেন। আপনাকে ও বহত রিসপেক্ট করে...।'

আমি অবাক হয়ে মহাবীরজীর মুখের দিকে তাকালাম: 'কী কথা?'

'ওই কাটা দাগের ব্যাপারটা...।'

'ও—।' বলে আমি চুপ করে গেলাম।

স্টেশনের বাইরে অনেক ফাঁকা জায়গা। তার বেশিরভাগ ঘাসে ছাওয়া—বাকি জায়গায় দুটো ছোট-ছোট পুকুর। তা ছাড়া এদিকে-ওদিকে অনেক বড়-বড় গাছ। তাদের সবুজ পাতা বাতাসে দুলছে। আর সেইসব পাতার আড়াল থেকে ঘুঘু আর বসন্তবৌরি ডাকছে। কয়েক সেকেন্ডের জন্যে 'দাওয়াই টাউন'-এর কথা ভুলে গেলাম।

স্টেশন এলাকা ছেড়ে বেরোতেই ঢালু কাঁচা পথ। সেই পথ ধরে নেমে আট-দশ পা গেলে সারি বেঁধে কয়েকটা দোকান। দোকানগুলো ছাড়িয়ে একটা টিউবওয়েল। সেখানে লোকজন বালতি আর কলসি নিয়ে জল ভরছে।

টিউবওয়েলের পরে রাস্তার ধার ঘেঁষে একটা জিপগাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। তার সামনের কাচে কোম্পানির নাম লেখা একটা নীল রঙের স্টিকার লাগানো।

মহাবীরজী বললেন, 'ওই যে, মিসরাসাহেবের জিপ। উনি জিপের ভেতরে বসে আছেন।'

আমরা পায়ে-পায়ে টিউবওয়েলের কাছে যেতেই একজন বেঁটেখাটো লোক জিপের প্যাসেঞ্জার সিট থেকে রাস্তায় নেমে দাঁড়াল। ইনিই বোধহয় মিস্টার মিশ্র।

কাছে যেতেই মহাবীর যাদব পরিচয় করিয়ে দিলেন।

'মিশ্র ল্যাবরেটরিজ প্রাইভেট লিমিটেড' নামের বিখ্যাত মেডিসিন কোম্পানির চেয়ারম্যান অ্যান্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিস্টার বদ্রীনাথ মিশ্র।

বদ্রীনাথজীর চোখে কালো ফ্রেমের চশমা। চেহারা বেশ মোটাসোটা। গাল দুটো ডুমো-ডুমো। ঠোঁটের ওপরে কাঁচাপাকা গোঁফ। মাথার চুল যথেষ্ট পরিমাণে তেল-টেল মেখে পেতে আঁচড়ানো। দু-চোখে মজাদার মেজাজের ছোঁওয়া।

সাদা হাফ শার্ট কালো প্যান্টের ভেতরে গুঁজে পরেছেন। কোমরে বেল্ট বেঁধে নেয়াপাতি ভুঁড়িটিকে সামলে-সুমলে রেখেছেন।

মিস্টার মিশ্রকে দেখে মোটেই কোনও হাই-ফাই কোম্পানির চেয়ারম্যান অথবা ম্যানেজিং ডিরেক্টর—কোনওটাই মনে হয় না। বরং ওঁর চেহারা আর চোখ-মুখ দেখে ফিল্মের কমেডিয়ান বলে মনে হয়।

মিশ্রজী পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে একটা সিগারেট নিয়ে ঠোঁটে বসালেন। আমাকে আর মহাবীরজীকে অফার করলেন।

আমি হেসে জানালাম যে, ট্রেনের ধোঁয়াতেই আমি বুঁদ হয়ে আছি, অন্য কোনও ধোঁয়াতে তেমন মজা পাই না।

মহাবীর যাদব সিগারেটের অফার অ্যাকসেপ্ট করলেন। মিশ্রসাহেব পকেট থেকে সোনালি লাইটার বের করে মহাবীরজীর সিগারেট ধরিয়ে দিলেন, তারপর নিজেরটা ধরালেন।

বেশ মওজ করে ধোঁয়া ছাড়লেন দুজনে। সেই ধোঁয়ার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন বদ্রীনাথ মিশ্র। তারপর মহাবীরজীর দিকে নজর নিয়ে এসে ভুরু উঁচিয়ে হাত নেড়ে জিগ্যেস করলেন, 'এভাবে রাস্তায় দাঁড়িয়েই কথা হবে?'

আমি বললাম, 'স্টেশানে আমার ঘরটায় গিয়ে আমরা বসতে পারি—।'

মহাবীর মিশ্রসাহেবকে অনুরোধ করলেন, 'চলিয়ে না, স্যার...।'

কিন্তু মিশ্রসাহেব কী ভেবে হাত নেড়ে বললেন, 'নহি—হামে জরা জলদি ভি হ্যায়। ছোটাসা ডিসকাশন—এহিপে ডিসকাস কর লেতে হ্যায়...।'

তো ওই জিপের পাশে দাঁড়িয়েই আমাদের কথাবার্তা হল। মিশ্রসাহেব আর মহাবীরজী একটু নীচু গলায় কথা বলছিলেন। ওঁদের ঢঙের ছোঁয়ায় আমারও গলার পরদা কখন যেন নেমে গেল।

সত্যি-সত্যিই ছোট ডিসকাশন।

মিশ্রসাহেবের সোজাসুজি বক্তব্য, 'দাওয়াই টাউন'-এর ভূতুড়ে বদনাম না হঠালে তিনি ওটা কিনতে পারবেন না আর ফ্যাক্টরি তৈরির জন্যে টাকাপয়সাও ইনভেস্ট করতে পারবেন না। কারণ, ফ্যাক্টরিতে লোকজন স্টাফ সব লাগালে তারা হয়তো ভূত-পিরেতের ভয়ে পালিয়েই যাবে। তখন মিশ্রজীর ইনভেস্ট করা কোটি-কোটি টাকার সত্যনাশ হবে। সুতরাং, আগে জায়গাটাকে শোধন করতে হবে। মহাবীরজী দায়িত্ব নিয়ে যদি সে-কাজ করে দিতে পারেন তাহলে 'দাওয়াই টাউন' কেনার ব্যাপারে মিশ্রসাহেব শান্তিতে এগোতে পারেন। জায়গাটাতে পুজো-পাঠ আর শোধনের কাজের জন্য যা খরচাখরচ হবে তার জন্যে মিশ্রজী এখনই পাঁচ হাজার টাকা দিতে রাজি আছেন।

কথা বলতে-বলতে বদ্রীনাথ মিশ্র পকেট থেকে একশো টাকার নোটের গোছা বের করে ফেলেছেন এবং গুনতে শুরু করেছেন।

আমি খানিকটা অপ্রস্তুত হয়ে মহাবীর যাদবের দিকে তাকালাম। দেখলাম, ওঁর সরল চোখে লোভের চকচকে ছায়া।

আমার মনে হচ্ছিল, এ-ব্যাপারটার মধ্যে না ঢুকলেই ভালো হত। কিন্তু এখন তো ফেরার পথ নেই!

বদ্রীনাথজীর হাত থেকে পাঁচ হাজার টাকা নেওয়ার সময় মহাবীর যাদব যা বললেন তাতে আমার ফেরার পথ আরও বন্ধ হয়ে গেল।

'আপনি চিন্তা করবেন না, মিসরাজী। মাস্টারজী আমার সঙ্গে আছেন। ওনার মতো পড়ালিখা আদমি সঙ্গে থাকলে আমি অনেক ভরোসা পাই। আমাদের মহল্লায় সবাই মাস্টারজীকে বহত রিসপেক্ট করে...।'

বদ্রীনাথ মিশ্র আমার দিকে একবার দেখলেন। বোধহয় আঁচ করতে চাইলেন, 'দাওয়াই টাউন'-এর ভূতিয়াঘর বদনাম ঘোচানোর কাজে আমি পজিটিভ রোল প্লে করতে পারব কি না।

আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম, মহাবীর যাদবকে দেখে যতটা সহজ-সরল মনে হয় আসলে হয়তো ততটা নন। আরও মনে হল, মিশ্রসাহেব যদি ওই বিশাল জমিটা কিনে নেন, তাহলে মিডলম্যান হিসেবে মহাবীর যাদবেরও দশ-বিশ হাজার টাকা ইনকাম হয়ে যাবে।

মহল্লার লোকজন যাতে ঝামেলা না করে সেইজন্যেই কি সবাই 'রিসপেক্ট' করে এমন একজনকে সঙ্গে চাইছেন মহাবীর?

আমার মধ্যে একটা অস্বস্তি কাজ করতে লাগল। না, জমির দালালির টাকায় আমার কোনও আকর্ষণ নেই। তবে ওই 'দাওয়াই টাউন'-এর ভূত তাড়ানোর ব্যাপারে আমার যথেষ্ট আকর্ষণ এবং আগ্রহ আছে।

কথাবার্তা শেষ হয়ে গিয়েছিল। হাসিমুখে জিপে ওঠার সময় বদ্রীনাথজী মহাবীর যাদবের ডানহাতটা ধরে সামান্য ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, 'ওই জমিন যদি কিনে নিতে পারি তো আপনাকে একেবারে খুশ করে দিব। আপ বেফিকর রহিয়ে, মহাবীরজী—।'

জিপ স্টার্ট দিল। ধুলো উড়িয়ে বদ্রীনাথ মিশ্র চলে গেলেন।

মহাবীর যাদব মনের আনন্দ যেন আর চেপে রাখতে পারছিলেন না। আমার হাত ধরে আবেগমাখা গলায় বললেন, 'আপনি সাথে থাকলে আমি অনেক জোর পাব, পমেশজী। জনতা সেবাকেন্দ্রের ওই ভূতিয়াঘর বদনাম—উও বদনাম য্যায়সে ভি হো মিটানা হি পড়েগা, কিঁউ?'

আমি ঘাড় নেড়ে বললাম, 'অবশ্যই—।'

মহাবীর যাদব খুশি হলেও কেন জানি না, আমি খুব একটা খুশি হতে পারছিলাম না। ওই হাসপাতালটার ভেতরের নানান অজানা ভয় আমার বুকের ভেতরে আঁচড় কাটছিল। হিংস্র বাঘের নখের আঁচড়।

'দাওয়াই টাউন'-এর বদনাম ঘোচানোর ব্যাপারে মহাবীর যাদবের আগ্রহের একটা বড় কারণ হয়তো ওঁর বোন লছমি, কিন্তু তার পাশাপাশি লক্ষ্মীলাভের আগ্রহটাও বোধহয় বড় কম নয়। গতকাল হাবভাব আর কথাবার্তা শুনেই বুঝেছি বদ্রিনাথ মিশ্র যথেষ্ট বড়লোক এবং 'দাওয়াই টাউন'-এর জায়গাটাতে উনি সিরিয়াসলি একটা ফ্যাক্টরি খুলতে চান।

কিন্তু আমি যে জড়িয়ে পড়লাম সেটার কী করি!

ব্যাপারটা নিয়ে এ-কথা সে-কথা ভেবে কয়েকটা দিন কাটিয়ে দিলাম। তারপর হঠাৎ করেই ঠান্ডা লাগিয়ে জ্বরে পড়লাম।

সময়টা ফাল্গুন মাস হলেও বেশ কয়েকদিন ধরে শুধু বৃষ্টি আর বৃষ্টি! তাতেই হয়তো কোন এক ফাঁকে ঠান্ডা থাবা বসিয়ে দিয়েছে।

এক দুপুরে চাদর মুড়ি দিয়ে খাটিয়ায় শুয়ে আছি, এমন সময় মহাবীরজী আমার আস্তানায় এলেন। বাইরে তখন ঘ্যানঘেনে বৃষ্টি চলছে।

ওঁকে দেখে আমি তাড়াতাড়ি উঠে বসলাম। ঘরের একমাত্র মোড়াটা কাছেই ছিল। মহাবীরজীকে সেখানে বসতে বললাম।

উনি সে-কথা না শুনে তক্তপোশে আমার পাশটিতে বসলেন। বললেন, 'আজ কেমন আছেন?'

আমি অল্প হেসে বললাম, 'কালকের চেয়ে বেটার...।'

মহাবীরজী আমার গায়ে হাত দিয়ে জ্বর পরখ করলেন। বললেন, 'এরকম বে-টাইমের বারিশ—মহল্লাতে অনেকেরই বোখার-উখার হচ্ছে। তা আপনি দাওয়াই নিচ্ছেন তো?'

ওঁকে জানালাম যে, আমার সঙ্গে সবসময় হোমিওপ্যাথিক ওষুধ থাকে—সেটাই রেগুলার চার্জ করছি...।

মহাবীর যাদব খোলা দরজা দিয়ে বৃষ্টি দেখছিলেন। ওঁর চোখ দেখে মনে হচ্ছিল, উনি দূরে কোথায় যেন হারিয়ে গেছেন।

হঠাৎই আমার দিকে ফিরে তাকালেন মহাবীর। ওঁর চোখের দৃষ্টিটা কেমন অদ্ভুত লাগল। মনে হল, উনি আমাকে কিছু বলতে চান।

কয়েক সেকেন্ড ওইরকমভাবে তাকিয়ে থাকার পর বললেন, 'পমেশজী, আজ লছমির জনমদিন। লছমি কেমন করে মারা গেল সেই কাহানিটা আজ আপনাকে বলব...।'

আমি চুপ করে রইলাম। এরকম একটা মুহূর্তে কথা বলতে নেই। কথা বললে ওঁর ভাবনার সাবলীল স্রোত এলোমেলো হয়ে যাবে।

'লছমি আমার পেয়ারি বহেনা ছিল। সুন্দর, ফুটফুটে—যেন একটা কথা-বলা পুতুল...।'

ঘটনাটা বহুকাল আগের। মহাবীর যাদবের বয়েস তখন ছিল তেরো কি চোদ্দো বছর। আর লছমির বয়েস? এগারো কি বারো। সময়টা ছিল বর্ষাকাল। ক'দিন ছাড়া-ছাড়াই ঘোর বৃষ্টি। আর মেঘ? মেঘের দল তখন টুয়েন্টি ফোর সেভেন আকাশের দখল নিয়ে নিয়েছে। সবসময়েই গুড়গুড় গুড়ুম-গুড়ুম চলছে। আর বিজলির তলোয়ার রাত নেই দিন নেই আকাশকে ফালা-ফালা করে চলেছে।

এরকম একটা দুর্যোগের সময়ে আর-একটা দুর্যোগ নেমে এসেছিল রাখিতপুরে।

মহাবীরজীদের মহল্লা থেকে কিলোমিটারটাক দূরে একটা প্রাইমারি স্কুল ছিল। সেই স্কুলে ক্লাস ফোর-এ পড়ত লছমি। স্কুলের অ্যানুয়াল পরীক্ষার রেজাল্ট ভালো হয়েছে বলে স্কুলের প্রেসিডেন্ট ভোজের আয়োজন করেছিলেন। সেই ভোজ খেয়ে স্কুলের অনেক ছেলেমেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ল। পেট ব্যথা, গা গুলোনো, তার সঙ্গে পেটখারাপের সমস্যা। তো সাতাশজন ছেলেমেয়েকে ওই জনতা সেবাকেন্দ্রে ভরতি করা হয়েছিল। ওদের সবাইকে রাখা হয়েছিল পাঁচতলার চিলড্রেন্স ওয়ার্ডে।

দু-দিন কাটতে না কাটতেই একটা মারাত্মক ঘটনা ঘটে গেল। এমন ঘটনা যার ওপরে কারও হাত ছিল না। সবটাই ওপরওয়ালার বিধান।

সময়টা ছিল সন্ধেবেলা। তখন বোধহয় সাড়ে ছ'টা কি সাতটা হবে। আকাশে মেঘ-বৃষ্টি আর বজ্র-বিদ্যুতের রাজ যেমন চলছিল সেটা সেদিন বিকেলের পর যেন চার-পাঁচগুণ বেড়ে গিয়েছিল। মহল্লার সবাই আলোচনা করছিল যে, এরকম দুর্যোগের ঘনঘটা তারা বহু বছরের মধ্যে দেখেনি।

ওই সাড়ে ছ'টা-সাতটার সময় একটা বাজ পড়ল। বাজ তো নয়, যেন অ্যাটম বোমা! আর তার আলো এমন ছিল যেন এক লক্ষ ওয়াটের ফ্ল্যাশগান ব্যবহার করে কেউ আকাশ থেকে আমাদের গাঁয়ের ফটো তুলল। সেই তীব্র আলোর টুকরো জানলা-দরজার ফাঁকফোকর আর ফাটল দিয়ে গাঁয়ের সবার ঘরের দেওয়ালে ঝলসে উঠল।

বাজ পড়ার পরই অনেক মানুষ কৌতূহলে উঁকিঝুঁকি মারল বাইরে। তখনই দেখা গেল, জনতা সেবাকেন্দ্রের বিল্ডিংটা দাউদাউ করে জ্বলছে। মহাবাজ ভীষণ আক্রোশে ছোবল মেরেছে তার মাথায়।

দুসরা গাঁয়ে কান্নাকাটির রোল পড়ে গেল। নিজেদের আত্মীয়স্বজন আর ছেলেমেয়ের চিন্তায় সবাই পাগলের মতো হয়ে গেল। বৃষ্টিতে ভিজেই সব ছুটল 'দাওয়াই টাউন'-এর দিকে। মুখে বুকফাটা আর্তনাদ।

সেসময়ে আবার একটা মহাবাজ পড়ল। ওই জনতা সেবাকেন্দ্রের বিল্ডিং-এই। আগুন আরও তেজিয়ান হয়ে উঠল। ছুটন্ত মানুষগুলো থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। ওরা আগুনের শিখা দেখতে পাচ্ছিল। বৃষ্টি সেই আগুনকে একফোঁটাও বাগে আনতে পারছিল না।

অন্ধকারের মধ্যেই মানুষের দল আবার ছুটতে শুরু করল। ওদের চোখের জল বৃষ্টির জলে মিশে যাচ্ছিল। গায়ের জামাকাপড় ভিজে সপসপে। ছুটতে খুবই অসুবিধে হচ্ছিল, কিন্তু তাও ওরা মরিয়া হয়ে ছুটছিল। তার সঙ্গে ছুটছিল ওদের কান্নাকাটি আর শোরগোল।

ওরা যখন দলে-দলে 'দাওয়াই টাউন'-এর কাছে এসে জায়গাটাকে ঘিরে দাঁড়াল, তখনই কোন এক ম্যাজিকে বৃষ্টিটা কমে গেল হঠাৎ। দাউদাউ আগুন আরও মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। 'দাওয়াই টাউন'-কে ঘিরে কান্না আর হইচইয়ের রোল উঠল। দু-দশজন সাহসী লোক ছুটে গিয়ে ঢুকে পড়ল বিল্ডিং-এর ভেতরে। কিন্তু তাতে শেষ পর্যন্ত কোনও লাভ হয়নি।

অ্যাক্সিডেন্টের পরে পুলিশ এসেছিল, দমকলের লোক এসেছিল, সরকারি দপ্তরের লোকজনও এসেছিল। প্রায় সাতদিন ধরে ওরা ছানবিন করেছিল। অনেক উন্ডেড মানুষকে ওরা চিকিৎসার জন্যে গোবিন্দপুর আর ধানবাদের দুটো হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল। তা ছাড়া অনেক লাশও উদ্ধার করেছিল।

তার মধ্যে ছোটমাপের সাতাশটা লাশ ছিল। সরাসরি সবাইকে শনাক্ত করা না গেলেও লোকজনকে জিগ্যেস করে, নানান রেকর্ড ঘেঁটে ওই সাতাশ জনের পরিচয় মোটামুটিভাবে জানা গিয়েছিল। কিন্তু তাতে আর লাভ হল কী!

ইনভেস্টিগেশানে আরও অনেক কিছু জানা গিয়েছিল।

প্রথমবার বাজ পড়তেই হসপিটালে আগুন ধরে গিয়েছিল। পাঁচতলা থেকে চারতলায় নামার সিঁড়ির অংশ বড়-বড় ফাটল ধরে ধসে পড়েছিল। বাচ্চাগুলো ভয় পেয়ে চিৎকার করে কাঁদতে-কাঁদতে ছুটোছুটি করে লিফটে উঠতে যায়।

হসপিটালে একটা প্রকাণ্ড মাপের লিফট ছিল। সেটা একইসঙ্গে ছিল পেশেন্ট পার্টি ওঠা-নামার লিফট আর মালপত্র, যন্ত্রপাতি, পেশেন্টসমেত স্ট্রেচার ইত্যাদি ওঠা-নামা করানোর সার্ভিস লিফট।

লিফটটা ছিল বলতে গেলে জোব চার্নকের আমলের, ওঠা-নামা করার সময় প্রবল শব্দ হত, আর আরোহীরা নিজেরাই হাতল ঘুরিয়ে ওটাকে চালাত—কোনও লিফটম্যান ছিল না।

তো ওই সাতাশটা ছেলেমেয়ে প্রাণের ভয়ে হুড়োহুড়ি করে সেই লিফটটায় উঠে পড়েছিল। হাতল ধরে এলোমেলো টানাটানি করে ওটাকে চালু করে দিয়েছিল। তারপর...।

তারপর লিফট যখন সবে নীচের দিকে নামতে শুরু করেছে তখন দ্বিতীয় বাজটা পড়ে। তাতে নিশ্চয়ই লিফটে আগুন ধরে গিয়েছিল, কারণ ওই বন্ধ লিফটের ভেতরেই সাতাশটা ছেলেমেয়ের বডি পাওয়া গিয়েছিল।

কী বীভৎস ব্যাপার! অথচ কারও কিছু করার ছিল না।

ওইসব পোড়া বডিগুলোর মধ্যে একটা ছিল লছমির।

লছমির কানে রুপোর মাকড়ি ছিল। ফোরেনসিক টিম জানিয়েছিল, ওই মাকড়িগুলো নাকি ট্রেস করা গিয়েছিল। রুপোর মেল্টিং পয়েন্ট ৯৬২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তাই ওগুলো বেঁকেচুরে গেলেও গলে যায়নি।

ব্যস, এই ঘটনার পর থেকে জনতা সেবাকেন্দ্র শেষ হয়ে গেল। ভূতিয়াঘর বলে দাগিও হয়ে গেল।

তারপর থেকে বাড়িটাকে নিয়ে নানান জনে নানান কথা বলে।

কেউ বলে, মাঝে-মাঝে নাকি বাড়িটায় আলো জ্বলতে দেখা যায়। আবার কেউ-কেউ ও-বাড়ি থেকে ছোট-ছোট ছেলেমেয়ের চিৎকার-চেঁচামেচি শুনেছে বলে দাবি করেছে।

রাখিতপুর এমনই একটা পিছিয়ে থাকা জায়গা যে, এখানে কোনও কিছুর গায়ে একবার দাগ লেগে গেলে সে-দাগ তোলা মুশকিল।

‘...ওই বেঁকেচুরে যাওয়া মাকড়ি দুটো আমার কাছে এখনও আছে। ছোটবেলা থেকে দেখেছি, ওই মাকড়িগুলো মুঠোর মধ্যে নিয়ে আমার মা কী কান্নাটাই না কাঁদত। সেই কান্না দেখে আমিও কেঁদে ফেলতাম। সবই ভগবানের মরজি...।’

লছমির মর্মান্তিক পরিণতির কথা বলতে-বলতে মহাবীর যাদব বারবার চোখ মুছছিলেন, নাক টানছিলেন। তারপর একসময় নিজেকে সামলে নিতে পারলেন। খোলা দরজার দিকে তাকিয়ে চুপচাপ বসে রইলেন।

কিছুক্ষণ পর আমি বললাম, ‘“দাওয়াই টাউন”-এর গায়ের দাগ তো তুলতে হবে। তার কিছু ব্যবস্থা করলেন?’

মহাবীরজী মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে এমনভাবে তাকালেন যেন আমি একজন অচেনা মানুষ। লছমির কথা বলতে-বলতে তিনি কোথায় যেন ভেসে চলে গেছেন।

অন্তত দশ সেকেন্ড পর আমার কথার খেই ধরতে পারলেন। তখন থেমে-থেমে নীচু গলায় বললেন, ‘আপনি তো জানেন, এ-গাঁয়ের উত্তরদিকে একটা ছোটামোটা শিবমন্দির আছে। ও-মন্দিরের পূজারি আছেন রামপরসাদ তিওয়ারি। তিওয়ারিজীকে আমি ব্যাপারটা খুলে বলেছি। বলেছি ওই দাগি অস্পাতালে ক্রিয়াকরম

করে ওটার দাগ মেটাতে হবে। তার জন্য আমি পূজারিজীকে পানসো রুপেয়া দকশিনা দেব। আর মন্দিরে ডোনেসান দেব পানসো রুপেয়া।

'আমার কথায় তিওয়ারিজী রাজি হয়ে গেছেন। উনি দিন আর লগন বলে দেবেন—তো সেইদিন ঠিক টাইমে গিয়ে আমরা ও-বিল্ডিংটায় সব রুমে ঠাকুরমশাইকে দিয়ে পুজোপাঠ করিয়ে নেব। তখন লছমির আতমা শান্তি পাবে, মুক্তি পাবে। শুধু লছমি কেন, ওই বিল্ডিং-এর সব আতমাই মুক্তি পেয়ে যাবে। তখন ''দাওয়াই টাউন''-এর শাপ মুছে যাবে। আমার মনও শান্তি পাবে।'

যে-শিবমন্দিরের কথা মহাবীর যাদব বলছেন, সেই শিবমন্দিরে আমি একবার পুজো দিতে গিয়েছিলাম। সেখানে হর-পার্বতীর মূর্তি রয়েছে। মন্দিরের পুরোহিত রামপ্রসাদ তিওয়ারিকে আমি দেখেছি। বয়েস বেশি নয়—বড়জোর চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হবে। ছিপছিপে লম্বা চেহারা। মাথায় কদমছাঁট চুল। পেছনদিকে জুতসই টিকি। পুজো করার সময় লক্ষ করেছি, রামপ্রসাদজী টিকিতে ফুল বেঁধে রাখেন। আর সবসময় ওঁর কপালে আঁকা থাকে চন্দনের আঁচড়।

মহাবীরজী 'ছোটামোটা' বললেও মন্দিরটা দেখতে বেশ সুন্দর। মন্দিরের মাথায় লাল রঙের ত্রিশূল। ছোট্ট দরজার মুখে ওপর থেকে ঝোলানো পেতলের ঘণ্টা। মন্দিরের সামনে শান বাঁধানো চত্বর। পুজোর সময় ভক্তরা সেখানে বসে পুজো দ্যাখে, অন্যসময় নাম-গান শোনে।

মন্দিরের দরজা থেকে হাতচারেক দূরে শানপাথরের ওপরে বসানো রয়েছে একটা ষাঁড়ের মূর্তি। মূর্তিটা মাপে ছোট, কালো পাথরের তৈরি—মন্দিরের মূর্তির দিকে চেয়ে ষাঁড়টা অলসভাবে বসে আছে।

আমি মহাবীরজীর দিকে তাকিয়ে ভাবছিলাম। তা হলে 'দাওয়াই টাউন'-এর বদনাম ঘোচাতে এগিয়ে যাব আমরা তিনজন—আমি, মহাবীর যাদব আর রামপ্রসাদ তিওয়ারি?

আমার মনটা একটু খচখচ করতে লাগল। আমাদের সঙ্গে মোহন যাদবকে নিলে হত না? ওর 'দাওয়াই টাউন'-এর ভেতরে ঘুরে আসার অভিজ্ঞতা আছে—সে চুরি করতে গিয়েই হোক, বা অন্য কোনও কু-কাজ করতে গিয়েই হোক। আমার মন বলছিল, মোহন আমাদের সঙ্গে গেলে ভালোই হবে। কিন্তু মোহন আমার সঙ্গে আর দেখা করতে আসেনি। মহল্লায় শুনলাম, ও ওর বাবাকে নিয়ে ধানবাদের কোন হাসপাতালে ট্রিটমেন্ট করাতে গেছে। তা ছাড়া ওকে দেখে যেটুকু বুঝেছি, ও আমাকে এড়িয়ে চলার মতন ছেলে নয়।

আমাকে অনেকক্ষণ চুপচাপ চেয়ে থাকতে দেখে মহাবীর জিগ্যেস করলেন, 'পমেশজী, কী ভাবছেন?'

'মোহন যাদবের কথা ভাবছি। ওকে আমাদের সঙ্গে নিলে হয় না?'

কথাটা বলে মোহনকে সঙ্গে নিতে চাওয়ার কারণটাও খুলে বললাম।

'ও যদি রাজি হয় নিতে পারেন। আমার তাতে কুছু আপত্তি নেই। ছোকরা জোয়ান আছে। তা ছাড়া ওর সাহসও আছে—' আপনমনে ওপর-নীচে মাথা নাড়লেন মহাবীরজী। তারপর: 'আপনি মোহনকে একবার বলে দেখেন। আপনি বললে ও হয়তো রাজি হয়ে যাবে। ও গেলে খালি হাতে ফিরবে না। বদ্রীনাথজীর রুপেয়া থেকে মোহনকে হিস্যা ভি দেব আমি...।'

মহাবীর যাদবের কথার মধ্যে 'হিস্যা' শব্দটা আমার কানে বাজল। কিন্তু এটা আমার মনে হচ্ছিল, 'দাওয়াই টাউন'-এর ভূতুড়েপনার সত্যি-সত্যি এসপার-ওসপার হওয়া দরকার।

আমার তখন বয়েস কম ছিল। তাই মনের যুক্তিবাদী অংশটা ছিল অনেক জোরালো। রাখিতপুরের লোকজন যতই ভূতিয়াঘরের ভূত সম্পর্কে গদগদ বিশ্বাস আর শ্রদ্ধা দেখাক, আমি বিনা পরীক্ষায় ব্যাপারটা কিছুতেই মেনে নেব না। এখন এলাকার তিন-তিনজন মানুষ যখন 'দাওয়াই টাউন'-এর বদনাম বিল্ডিং-এ অ্যাডভেঞ্চার করতে রাজি, তখন আমার আর দোষ কোথায়? এই সুযোগে ব্যাপারটার শেষ দেখে ছাড়া যাবে।

আমি মহাবীরজীকে বললাম যে, দু-একদিনের মধ্যেই আমি মোহনের সঙ্গে কথা বলব। তারপর আমরা চারজনে—মানে, আমি, মোহন, মহাবীরজী আর রামপ্রসাদ তিওয়ারিজী—নিজেদের মধ্যে একটা গোল

মিটিং সেরে নেব। মিটিং-এ রামপ্রসাদজী যে-দিনক্ষণ বলবেন আমরা সেই অনুযায়ী ‘দাওয়াই টাউন’-এ অপারেশান চালাব।

মহাবীর যাদব আমার কথায় ঘন-ঘন ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন।

বৃষ্টি তখন ধরে এসেছে। যদিও আকাশের ছাই রং আরও গাঢ় হয়েছে।

একদিন সন্ধেবেলা স্টেশান থেকে ফিরে দেখি মোহন যাদব আমার ঘরের দরজার পাশে একটা ধাপিতে বসে রয়েছে।

তখন ক’টা বাজে? সাতটা পনেরো কি সাতটা কুড়ি।

আমি আস্তানার কাছাকাছি আসতেই মোহন উঠে দাঁড়াল। আমার কাছে এসে চট করে ঝুঁকে পড়ল আমার পায়ের দিকে। হাত বাড়িয়ে দুটো হাঁটু পরপর ছুঁয়ে বলল, ‘পায় লাগু, মাস্টারজী—।’

আমি ওকে প্রণামে বাধা দেওয়ার সময়ই পেলাম না। মহাবীর যাদবের কথা মনে পড়লঃ ‘মোহনের থেকে আপনি কথা বের করতে পারবেন। আপনাকে ও বহত রিসপেক্ট করে...।’ সে-কথার শেষটুকু তো দেখছি সত্যি হল, কিন্তু সামনের অংশটুকু সত্যি হবে কি?

দেখা যাক। আজ আমি মোহনকে সোজাসাপটা জিগ্যেস করব। কারণ, ‘দাওয়াই টাউন’-এ হানা দেওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে আর দেরি করা যাবে না। মহাবীর যাদব, আমি আর পূজারিজী তো তৈরি হয়েই আছি। শুধু মোহনের ‘হ্যাঁ’ কিংবা ‘না’ জানতে পারলেই পূজারিজী দিনক্ষণ ঠিক করে ফেলবেন।

আমি দরজা খুলতে-খুলতে জিগ্যেস করলাম, ‘সেই যে আসবে বললে, তারপর তো উধাও হয়ে গেলে—!’

মোহন যাদব মাথা নীচু করে অপরাধীর গলায় বলল যে, ওর বাবা হঠাৎ খুব বেশি অসুস্থ হয়ে পড়ায় বাবাকে নিয়ে ও ধানবাদের জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে গিয়েছিল—আজ সকালেই ফিরেছে।

‘এসো, ভেতরে এসো—’ ওকে ঘরের ভেতরে ডাকলাম: ‘তোমার সঙ্গে খুব জরুরি কথা আছে।’

দেশলাই বের করে হ্যারিকেন জ্বেলে দিলাম। মোহনকে মোড়াটা এগিয়ে দিয়ে বসতে বললাম। একটা তাক থেকে বিস্কুটের কৌটো পেড়ে নিয়ে চারটে বিস্কুট বের করলাম। দুটো মোহনকে দিয়ে দুটো আমি নিলাম। আমার কাছে অতিথি আপ্যায়নের এ ছাড়া কোনও ব্যবস্থা নেই।

কুঁজো থেকে এক গ্লাস জল গড়িয়ে গ্লাসটা মোহনের মোড়ার পাশে রাখলাম।

মোহন যাদব কেমন যেন সঙ্কোচ পাচ্ছিল। বোধহয় ওর আর আমার জাতের তফাত নিয়ে ভাবছিল।

জলের গ্লাসটা ওর নাগালে রাখতেই ও বলে উঠল, ‘মাস্টারজী, আপনি এত তকলিফ করছেন কেন? পানি তো ম্যায় খুদ লে সকতা থা—।’

আমি ওকে স্নেহের ধমক দিলাম: ‘তুমি চুপ করো তো! যত্ত সব! নাও, বিস্কুট খাও—।’

বিস্কুট খেতে-খেতে মোহন ইতস্তত করে বলল, ‘আপনি উস দিন কলকাত্তায় গানের কথা বলছিলেন...।’

‘হ্যাঁ। এর মধ্যে আমি ট্রাঙ্ক-কল করে আমাদের ক্লাবের সেক্রেটারির সঙ্গে কথা বলে নিয়েছি। সামনের আগস্ট মাসে তুমি কলকাতায় যাচ্ছ—আমার সঙ্গে। সেখানে আমার বাড়িতে তুমি থাকবে। আমাদের ক্লাবের ফাংশানে গান গাইবে—তার জন্যে কিছু টাকাও পাবে—।’

আমার কথা শেষ হতে না হতেই মোহন মোড়া থেকে ছিটকে এসে আমার পায়ের কাছে বসে পড়ল। ওর দেশোয়ালি ভাষায় কীসব বলতে লাগল।

আমি হতচকিত ভাবটা কাটিয়ে উঠেই ‘কী করছ! কী করছ!’ বলে ওকে ধরে তুললামঃ ‘শোনো, মোহন। তোমার সঙ্গে আরও জরুরি কথা আছে...।’

মোহন কৃতজ্ঞতায় বিহ্বল ভাবটা সামলে নিয়ে আবার মোড়ায় গিয়ে বসল। উৎসুকভাবে চেয়ে রইল আমার মুখের দিকে।

'...আর পাঁচ-ছ'দিনের মধ্যেই আমরা ''দাওয়াই টাউন''-এ গিয়ে ঢুকছি। আমি, মহাবীর যাদবজী, ভোলেনাথের মন্দিরের পুরোহিত রামপ্রসাদ তেওয়ারিজী—আর তুমি।'

'আমি!'

'হ্যাঁ—তুমি। ''দাওয়াই টাউন''-এর ভূতিয়াঘর বদনাম খতম করতে হবে। তারপর ওই জমিতে কারখানা হবে। সেখানে তোমার এই গাঁয়ের ছেলেছোকরারা নোকরি পাবে—তুমিও পাবে।'

মোহন আমাকে এ নিয়ে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে লাগল। আমিও খোলাখুলি ওর সঙ্গে কথা বললাম।

শেষে বললাম, 'দ্যাখো, তোমার ওই ভূতুড়ে বাড়িতে ঢোকার এক্সপিরিয়েন্স আছে—তাই তোমাকে আমরা সঙ্গে চাইছি। তা ছাড়া তোমাকে কিছু টাকাও দেওয়া হবে।'

কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর মোহন ঘাড় কাত করে জানাল, ও আমাদের সঙ্গে যেতে রাজি।

আমি এবার আচমকা প্রশ্ন করলাম, 'তোমার গলায় আর গালে এরকম বাজেভাবে কেটে গেল কেমন করে?'

মোহন কেমন থতমত খেয়ে গেল। তারপর বিড়বিড় করে বলল, 'ছোড়িয়ে, মাস্টারজী। মেরা নসিব—।'

হ্যারিকেনের আলো মোহনের গলায়, গালে আর থুতনিতে পড়েছিল। সেই অল্প আলোতেও কাটা দাগটা বীভৎস দেখাচ্ছিল। আর ওর মুখে যে একটা ভয়ের পরত নেমে এল, সেটাও বোঝা গেল।

মোহন চুপ করে ঘরের দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে বসে ছিল।

'মোহন, প্লিজ বলো। শংকর শম্ভুর কসম, তোমার এসব কথা আমি ছাড়া আর কেউ জানবে না—কেউ না।'

মোহন চুপ করে রইল।

আমি মোহনকে বোঝাতে লাগলাম, আর বোঝাতে লাগলাম। বললাম যে, ওর ঘটনাটা জানতে পারলে 'দাওয়াই টাউন'-এ যখন আমরা চারজন যাব তখন আমাদের কাজের সুবিধে হবে। মোহন কি চায় না, 'দাওয়াই টাউন' পুরো সাফ হয়ে গিয়ে সেখানে কলকারখানা তৈরি হোক?

বেশ কিছুক্ষণ পর মোহন যাদব আপনমনে ঘাড় নাড়ল। বিড়বিড় করে বলল, 'হাঁ, মাস্টারজী—আপনি যেসব ফ্যাক্টরি-উক্টরির কথা বলছেন সেসব আমিও চাই। আমিও চাই যে, আমি দু-চার পয়সা কামাই—মহল্লার লোকজনের কাছ থেকে একটু ইজ্জত পাই। লেকিন...।'

'ওসব লেকিন-টেকিন শুনব না, মোহন—বলো...।' আমার কীরকম যেন একটা জেদ চেপে গিয়েছিল।

মোহন গ্লাস থেকে ঢকঢক করে জল খেল। গ্লাসটা মেঝেতে নামিয়ে রেখে হাত দিয়ে মুখ মুছল। তারপর কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'বলছি, তবে সিরফ আপনার জন্যে। সুনেন, মাস্টারসাব, ও অস্পাতালে অনেক খারাপ জিন আছে...।'

আমি আবার মোহনকে কথা দিলাম, ওর এই কাহিনি আমি কাউকে বলব না।

প্রায় একবছর আগে মোহন 'দাওয়াই টাউন'-এ ঢুকেছিল চুরি করতে। ও ছোকরু আর মুন্নার মার্ডারের ব্যাপারটা জানত। সেজন্যে মনে ওর ভয়ও ছিল। কিন্তু অভাব বড় বালাই। গান-টান গেয়ে প্রচুর তারিফ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু পয়সা পাওয়া যায় না। জোয়ান ছেলে হয়েও ও কোনও কাম-কাজ জোটাতে পারেনি, সেটাই ওর সবচেয়ে বড় অপরাধ। তার তুলনায় চোরি আর কী এমন বুরা কাম!

নানান লোকের কাছে মোহন শুনেছিল যে, 'দাওয়াই টাউন'-এর ওই বিশাল বিল্ডিংটার ভেতরে অনেক দামি-দামি সামান আছে। বেঞ্চি, টেবিল, খাটিয়া ইত্যাদি হরেক ফার্নিচার থেকে শুরু করে প্রচুর ডাক্তারি যন্ত্রপাতি এখানে-সেখানে পড়ে আছে। এ ছাড়া কপাল ভালো থাকলে ওই অ্যাক্সিডেন্টে মারা যাওয়া লোকজনের পোড়া গয়নার টুকরোটাকরাও মিলে যেতে পারে।

‘তো একদিন দুপুরে আমি সবার চোখ এড়িয়ে ওই দাগি বিল্ডিং-এ ঢুকে পড়ি। আপনার কাছে কবুল করছি যে, ছোটা-মোটা চোরি-ওরির অভ্যাস আমার বেশিদিন নয়—মাত্র পাঁচ-সাত বছরের। কী করব! পাপী পেট কা সওয়াল।

‘চোরাই মাল উঠিয়ে আনার জন্যে আমার হাতে একটা বোরা ছিল। বোরা, মানে বস্তা। সেটা নিয়ে আমি তো সাফ ওই বিল্ডিং-এ ঢুকে গেলাম। উসকে বাদ...।’

বিল্ডিংটায় ঢোকার সঙ্গে-সঙ্গে মোহন যাদবের নাকে এসেছিল পোড়া গন্ধ। আর একইসঙ্গে একটা অদ্ভুত জিনিস ও লক্ষ করেছিল: বিল্ডিং-এর ভেতরটা ঘুটঘুটে অন্ধকার। এটা মোহনের অবাক লেগেছিল, কারণ, ও দেখতে পেল, একতলার তিনটে জানলায় একটা করে পাল্লা নেই—কোনওটা খসে গেছে, আবার কোনওটা কবজা ভেঙে ঝুলে গেছে।

সেইসব আধখোলা জানলা দিয়ে ঘরগুলোতে আলো ঢোকার কথা, অথচ সেরকম কোনও আলো চোখে পড়েনি ওর। চারপাশটা যেন মনে হচ্ছিল ঘুটঘুটে অন্ধকার। আর সেই অন্ধকারের ভেতর থেকে বিচিত্র সব ধাতব শব্দ আসছে। অথচ মোহন যখন বিল্ডিংটায় ঢোকে তখন এই শব্দগুলো ছিল না।

মোহন অন্ধের মতো হাতড়ে-হাতড়ে কোনওরকমে চলাফেরার চেষ্টা করছিল। দু’বার হোঁচট খেয়ে পড়েও গেল। পড়ল লোহালক্কড়ের টুকরোর ওপরে। হাত-পা কয়েক জায়গায় কেটে-ছড়ে গেল। জ্বালা করতে লাগল। ওই অবস্থাতেই ও দোতলায় ওঠার সিঁড়িটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে লাগল। কোনদিকে সিঁড়িটা? অন্ধকারে তো কিছুই দেখা যাচ্ছে না! একটা টর্চ সঙ্গে নিয়ে এলে খুব ভালো হত।

অন্ধকারে হাতড়ে দু-চারটে লোহার টুকরো কুড়িয়ে নিল ও। বস্তার মধ্যে ঢোকাল। কিন্তু এগুলো বেচে আর ক’পয়সা হবে! হতাশ মোহন হঠাৎ দেখতে পেল, অন্ধকারে দুটো ছোট-ছোট আলো জ্বলছে—দুটোই লাল রঙের! একটা আলো তিরচিহ্নের মতো। আর তার ঠিক ওপরে একটা আলো ইংরেজিতে ‘চার’ সংখ্যাটা দেখাচ্ছে।

আলোটা মোহনকে টানছিল। টানটা জোরালো কোনও চুম্বকের চেয়েও তীব্র। ভালো-মন্দ কিছু ভেবে ওঠার আগেই মোহনের পা চলতে শুরু করে দিয়েছিল। ভাঙাচোরা জিনিসের টুকরোটাকরা মাড়িয়ে, ঠোক্কর খেয়ে, হোঁচট খেয়ে মোহন সেই তিরচিহ্ন অথবা ‘চার’ সংখ্যাটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। ওর মাথায় কেমন যেন ঘোর লেগে গিয়েছিল। মনে হচ্ছিল, ওই লাল আলোর কাছে ওর যাওয়া চাই—ওটাকে ছোঁওয়া চাই।

এইরকম একটা সময়ে ওর পিঠে কেউ যেন এক প্রচণ্ড আঘাত করল। মনে হল, একটা ভারী লাঠি অথবা লোহার রড কেউ বসিয়ে দিয়েছে পিঠে। মোহন মুখ থুবড়ে পড়ল মেঝেতে। যন্ত্রণায় গুঙিয়ে উঠল। ওর নাকে-মুখে ধুলো-ময়লা ঢুকে গেল। বস্তাটা ছিটকে গেল হাত থেকে।

ও কোনওরকমে উঠে বসল। পিঠে অসহ্য যন্ত্রণা। চারিদিকে তাকিয়ে লাল আলোয় লেখা তিরচিহ্ন অথবা সংখ্যাটাকে দেখতে পেল না। একটা চাপা গর্জন ওর কানে এল। চিতাবাঘ, নাকি নেকড়ের গর্জন?

মোহন ভয় পেয়ে গেল। চুরির লোভ পলকে মুছে গেল ওর মন থেকে। ওর মন তখন একটাই কথা বলছিল: ‘পালাও! পালাও!’

কিন্তু পালাবে কোনদিকে? দরজাটা যে ঠিক কোনদিকে সেটাই মোহনের গুলিয়ে গেছে।

গর্জনটা শোনা গেল আবার। খুব চাপা। যেন একটা মোটরগাড়ির ইঞ্জিন ধিকিধিকি চলছে।

মোহন উঠে দাঁড়াল। কিন্তু উঠে দাঁড়াতেই পিঠের ব্যথাটা যেন বর্শার মতো বিঁধল। এদিক-ওদিক নজর চালিয়ে মোহন পাগলের মতো দরজাটা খুঁজতে লাগল। কোথায় দরজাটা? কোথায়?

গর্জনটা হঠাৎ বেড়ে উঠল। একটা ক্ষিপ্ত পশু যেন তেড়ে আসবে এখুনি। এই পোড়ো বিল্ডিংটায় কোনও পশু কি এসে আস্তানা গেড়েছে?

মোহনের সন্ধানী চোখ দরজাটা এবার খুঁজে পেল। ওই তো, আধভাঙা পাল্লার ফাঁক দিয়ে খানিকটা আলো দেখা যাচ্ছে!

ও সেদিকে পা বাড়াতেই গর্জনটা বেড়ে উঠল। লোহায়-লোহায় ঠোকাঠুকির শব্দ হল 'খটাং-খটাং'। আর কী যেন একটা বিদ্যুৎঝলকের মতো মোহনের গাল ছুঁয়ে গেল।

তারপরই অসহ্য জ্বালা। গালে হাত চলে গেল ওর। গাল ভিজে, চটচট করছে।

সেই হাত চোখের সামনে নিয়ে এসে কিছু দেখা না গেলেও ও বুঝতে পারল ওর হাত রক্তে ভেজা। ওর গাল আর গলা গড়িয়ে রক্ত পড়ছে। সেই সঙ্গে তীব্র জ্বালা-যন্ত্রণা। বুক ধকধক করছে। গলা শুকিয়ে কাঠ।

গালে হাত চেপে মোহন পাগলের মতো ছুটে যেতে চাইল দরজার দিকে। গাঢ় অন্ধকারে দরজার জ্যামিতিক চেহারার আলোর টুকরোটা যেন দিশাহীন সাগরে এক লাইট হাউস। কিন্তু ছুটে পালাতে গিয়ে কতবার যে হোঁচট খেল, উলটে পড়ল!

পা কেটে গেল কত জায়গায়, হাঁটু ছড়ে গেল, কিন্তু মোহন তাড়া খাওয়া নেড়ি কুকুরের মতো পৌঁছে গেল বিল্ডিং-এর দরজায়।

তারপর গালে হাত চেপে বিল্ডিং-এর বাইরে।

তখনও আকাশে বেশ আলো। সেই আকাশ আর গাছপালার দিকে তাকিয়ে আনন্দে কয়েকটা বড়-বড় শ্বাস নিয়েছিল ও। এখন ও বুঝতে পারছে, জীবন কত দামি! শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে পারাটা ওপরওয়ালার কত বড় আশীর্বাদ!

তারপর মোহন পাশের মহল্লায় ওর একজন চেনা কম্পাউন্ডার সত্যদেও দুবেকে দিয়ে গালের কাটা-ছেঁড়ার ট্রিটমেন্ট করায়। দুবেজী ওঁর সাধ্যমতো ট্রিটমেন্ট করলেও বীভৎস কাটা দাগটা থেকেই গেছে।

ওর কাহিনি শেষ করে মোহন যাদব একটা লম্বা শ্বাস ফেলে বলল, 'মাস্টারজী, সবই আমার নসিব...।'

আমি মোহনের গল্পটা শোনার পর কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম। কেন জানি না মনে হল, যে-কাজে আমরা চারজন এগোচ্ছি সেই কাজটা খুব একটা সহজ হবে না।

মোহনকে শুধু বললাম, 'পরশু রাত আটটার সময় আমরা চারজন মিটিং-এ বসব। ''দাওয়াই টাউন''-এ রওনা হওয়ার আগে কয়েকটা ব্যাপার আমাদের নিজেদের মধ্যে একটু আলোচনা করে নেওয়া জরুরি। তুমি ঠিক আটটায় আমার ঘরে চলে আসবে।'

মোহন ঘাড় কাত করল। তারপর আমাকে নমস্কার জানিয়ে চলে গেল। আমি অকারণেই ওর গালের কাটা দাগটার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলাম।

আজ ফাল্গুনী—মানে, বাসন্তী পূর্ণিমা।

আমাদের পণ্ডিতজী রামপ্রসাদ তিওয়ারি আজকের দিনটাকেই অভিযানের পক্ষে মানানসই দিন বলে ঠিক করেছেন। আরও বলেছেন, বিকেল তিনটে একচল্লিশ মিনিট গতে শুভ সময়ের শুরু। তাই আমরা চারজনে সাড়ে তিনটের সময় 'দাওয়াই টাউন'-এ এসে হাজির হয়েছি।

রামপ্রসাদজী প্রথমে বিল্ডিং-এর সামনে দাঁড়িয়ে বিড়বিড় করে কীসব মন্ত্র পড়লেন। তারপর কপালে হাত ঠেকিয়ে বললেন, 'জয়-জয় শিবশম্ভু! হর হর মহাদেও!'

রামপ্রসাদজীর পরনে গেরুয়া। বাঁ-হাতে একটা বড় কমণ্ডলু, ডানহাতে একটা ছোট ত্রিশূল। কপালে চন্দন লেপা, টিকিতে বাঁধা আকন্দ ফুল। এ ছাড়া কোমরে গোঁজা রয়েছে টর্চ।

মানুষটা রোগাসোগা হলে কী হবে, ওঁর সাহসের রীতিমতো প্রশংসা করতে হয়। সেই শুরু থেকেই বলে আসছেন, 'আমার দেওতা শিবশম্ভুর চেয়ে শক্তিমান এই ত্রিভুবনে কেউ নেই। ভূতপিরেত সব আমার ভোলেনাথজীর নওকর। ওই ''দাওয়াই টাউন''-এ যত ভূত-জিন আছে সব শিবশম্ভুর নামে ভেগে যাবে। যারা যাবে না, তাদের ভোলেনাথজীর এই ত্রিশূল খতম করবে—' বলে হাতের ত্রিশূলটাকে মাথার ওপরে উঁচিয়ে ধরেছেন পণ্ডিতজী।

রামপ্রসাদজীর সাহস দেখে আমরা তিনজনে মনে খানিকটা সাহস পাচ্ছিলাম। তা ছাড়া পণ্ডিতজী আজকের এই অভিযানের জন্যে মন্দিরে দু-ঘণ্টার যজ্ঞ করেছেন। যজ্ঞের পর তিনি মহাদেবের মনের কথা শুনতে পেয়েছেন: আমাদের অভিযান সফল হবেই।

বিল্ডিং-এর সামনে দাঁড়িয়ে মন্ত্রোচ্চারণের পর পণ্ডিতজী গোটা বিল্ডিংটাকে প্রদক্ষিণ করা শুরু করলেন। মন্ত্র বিড়বিড় করতে-করতে কমণ্ডলুর জল ছেটাতে লাগলেন। মন্ত্রের মধ্যে শুধু 'জয়-জয় শিবশম্ভু' অংশটুকু আমি বুঝতে পারছিলাম। পণ্ডিতজীর পেছন-পেছন আমরা তিনজনও বিল্ডিংটাকে ঘিরে হাঁটছিলাম।

আকাশে মেঘ, তাই চারপাশটা কেমন গুমোট। একটা ফ্যাকাশে ঘোলাটে আলো ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। গোটা এলাকাটা কেমন নিঝঝুম চুপচাপ। কাছে-দূরে যেসব গাছপালা দেখা যাচ্ছে তাদের একটি পাতাও নড়ছে না। মনে হচ্ছে, ওরা দম বন্ধ করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আমাদের কাণ্ডকারখানা দেখছে।

ওরা ছাড়া আর কোনও দর্শক নেই—যদি দু-চারটে কাক, শালিখ, বুলবুল কিংবা ফিঙেকে আমরা হিসেবের মধ্যে না ধরি। যাদবদের মহল্লা আর তার আশপাশে মহাবীরজী আর রামপ্রসাদজী অনেক আগে থেকেই জানিয়ে দিয়েছেন যে, 'দাওয়াই টাউন'-এর শান্তি-স্বস্ত্যয়নের সময় আমরা চারজন ছাড়া আর কেউ হাজির থাকলে সমস্ত কাজ পণ্ড হয়ে যাবে। তাই কৌতূহল থাকলেও কেউ আসেনি।

এই কাজে আমাদের সঙ্গে মোহন যাদবের থাকাটা ওর বৃদ্ধ মা-বাবা মোটেই পছন্দ করেননি—এমনকী ওঁরা অনেক কান্নাকাটিও করেছেন। কিন্তু মোহন ওর জেদে অনড়—আমাদের সঙ্গে জোট বেঁধে 'দাওয়াই টাউন'-এর একটা এসপার-ওসপার ব্যবস্থা ও করবেই। এতে আমার মনে হয়েছে, গালের ওই কাটা দাগটার বদলা নেওয়ার এই সুযোগ ও ছাড়বে না।

মোহনের গায়ে রুলটানা বাদামি ফতুয়া আর একটা কালো রঙের হাফপ্যান্ট। প্যান্টের পকেটে রয়েছে টর্চ। হাতে ফুটচারেক লম্বা একটা লোহার রড। চোয়াল শক্ত, নজর সতর্ক।

মহাবীর যাদব পরেছেন মালকোঁচা মেরে ধুতি, আর তার ওপরে হাফহাতা শার্ট। আমি পরেছি সাধারণ বুশ শার্ট আর প্যান্ট।

আমরা দুজনও নিরস্ত্র নই। আমাদের দুজনেরই হাতে রয়েছে শক্তপোক্ত বাঁশের লাঠি। এ ছাড়া আমরাও টর্চ রেখেছি সঙ্গে। মোহনের কাহিনি শোনার পর আমার মনে হয়েছিল, বিল্ডিং-এর ভেতরের ওই অদ্ভুত অন্ধকারের সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্যে আমরা চারজনই সঙ্গে টর্চ রাখব। এ-কথা আমি মিটিং-এর সময় বলেছিলাম। তাই চারটে মাঝারি মাপের টর্চ আমরা কিনেছি।

আমাদের এই অভিযানের জন্যে এ পর্যন্ত যা-যা খরচ হয়েছে তার সবটাই মহাবীর যাদব সামলেছেন। তিনি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, বদ্রীনাথ মিশ্রর কাছ থেকে যে টাকা তিনি পেয়েছেন এই কাজের সমস্ত খরচ তিনি সেই টাকা থেকেই চালাবেন। এই সিদ্ধান্ত আমরা সবাই মেনে নিয়েছি।

পণ্ডিতজীর মন্ত্র পড়ে বিল্ডিং প্রদক্ষিণের কাজ শেষ হলে আমরা বিল্ডিং-এর দরজার কাছে এসে দাঁড়ালাম।

আমি হাতঘড়ির দিকে তাকালাম: চারটে বেজে পাঁচ মিনিট।

তারপর মুখ তুললাম আকাশের দিকে। মনে হল যেন, মেঘের স্তর একটু বেশি গাঢ় হয়েছে। ব্যাপারটা আমার ভালো লাগল না।

পণ্ডিতজী বিল্ডিং-এর দরজায় কমণ্ডলু থেকে গঙ্গাজল ছিটিয়ে দিলেন। বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়লেন। হাতের ত্রিশূলটা প্রথমে নিজের কপালে ঠেকিয়ে তারপর একে-একে আমাদের তিনজনের কপালে ঠেকালেন। প্রত্যেকবার ঠেকানোর সঙ্গে-সঙ্গে চাপা গলায় বললেন, 'জয় শিবশম্ভু! জয় ভূতনাথ!'

তারপর আমাদের বললেন, 'অব অন্দর চলিয়ে। ডরনেকি কোই বাত নহি। ভোলেনাথজী খুদ হামারে সাথ হ্যায়। জয় বাবা ভোলেনাথ!'

আমরা চারজনে সাবধানে পা ফেলে অভিশপ্ত বাড়িটার ভেতরে ঢুকে পড়লাম। ঢোকার সঙ্গে-সঙ্গে মহাবীর যাদব ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। তারপর জড়ানো গলায় দু'বার ডুকরে উঠলেন, 'লছমি! লছমি!'

আমি মহাবীরজীর ঠিক পেছনেই দাঁড়িয়ে ছিলাম। ওঁর কাঁধে হাত রেখে সামান্য চাপ দিয়ে আলতো করে বললাম, 'মহাবীরজী, আপনে দর্দকো কাবুমে রাখিয়ে...।' টের পেলাম, মহাবীর যাদবের শরীর থরথর করে কাঁপছে।

দাগি বিল্ডিংটার ভেতরে ঢোকামাত্রই যে ব্যাপারটা আমাদের প্রথম ধাক্কা মারল, সেটা হল অন্ধকার।

যেদিকে তাকাই সেদিকেই চাপ-চাপ অন্ধকার। মোহনের কথা মিলে যাচ্ছে অক্ষরে-অক্ষরে।

রামপ্রসাদ তেওয়ারি আচমকা চিৎকার করে উঠলেন, 'জয়-জয় শিবশম্ভু!'

আমি চমকে উঠলাম। মহাবীর আর মোহনও বোধহয় চমকে উঠেছিল—অন্ধকারে ঠিক ঠাহর হল না। তেওয়ারিজীর চিৎকারের প্রতিধ্বনি ঘুরতে লাগল বাড়ির আনাচে-কানাচে।

রামপ্রসাদজীর চিৎকারের সঙ্গে-সঙ্গে ঝটাপটির শব্দ শোনা গেল। তারপর ডানার পতপত শব্দ। যেন অনেকগুলো পাখি দিশেহারা হয়ে ডানা ঝাপটাচ্ছে। দরজা আর জানলার ফাঁকফোকর দিয়ে কয়েকটা কালো-কালো পাখিকে উড়ে যেতেও দেখলাম।

রামপ্রসাদজী বললেন, 'সবাই টর্চ জ্বালুন। একতলার ঘরগুলোয় শান্তির জল ছিটিয়ে ত্রিশূল ঠেকিয়ে পবিত্র করতে হবে...।'

আমরা চারজনেই প্রায় একসঙ্গে টর্চের আলো জ্বাললাম। তখনই মনে হল, কারা যেন আলোর বৃত্ত থেকে একলাফে ছিটকে সরে গেল গাঢ় অন্ধকারে।

মেঝেতে টর্চের আলো ফেলে আমরা কোনওরকমে এগিয়ে চললাম। মেঝেতে পড়ে আছে অজস্র পোড়া কাগজ, পুড়ে যাওয়া পরদার অংশ, তুবড়ে যাওয়া লোহার বালতি, বাটি, গ্লাস আর লোহার পাইপ। সেসব ডিঙিয়ে খুব সাবধানে পা ফেলে আমরা প্রথম ঘরটায় ঢুকলাম।

ঘরটা আগুনে পুড়েও যেন পোড়েনি। দেওয়ালগুলো ভাঙাচোরা, ফাটল ধরা। সব জায়গায় ভুসোকালির ছোপ। তার ওপরে ধুলোর স্তর পড়েছে, দেওয়ালের কোণে মাকড়সা জাল বুনেছে। আর ঘরের এদিকে-সেদিকে ছড়িয়ে রয়েছে ভাঙা চেয়ার-টেবিল।

এক কোণে একটা আলমারি। তার পাশে দেওয়ালের ব্র্যাকেটে ঝুলছে কয়েকটা আধপোড়া পোশাক। তার নীচে মেঝেতে পড়ে আছে দুটো স্টেথোস্কোপ। তাদের রবারের পাইপ গলে গেছে।

হঠাৎ পোড়া গন্ধের ঝাপটা নাকে এল।

অবাক হয়ে গেলাম। এত বছর পরেও এই পোড়া গন্ধ!

মহাবীর যাদব বললেন, 'তাজ্জব ব্যাপার!'

মোহন যাদব বলল, 'মাস্টারজী, আমি কিন্তু পোড়া গন্ধ পাইনি।'

আমরা সবাই নীচু গলায় কথা বলছিলাম।

রামপ্রসাদজী ওঁর মন্ত্র পড়া থামাননি। ওঁর স্বর সাগরের ঢেউয়ের মতো ওঠানামা করছিল। টর্চের বিক্ষিপ্ত আলোয় দেখলাম, ওঁর বাঁ-হাতে কমণ্ডলু এবং টর্চ। ডান হাতে ত্রিশূল। সেই অবস্থাতেই মন্ত্র পড়তে-পড়তে শান্তির জল ছিটিয়ে চলেছেন।

আমাদের চারটে টর্চ এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করে আলোর আঁকিবুকি কাটছিল। সেই আলোর আভায় দেখলাম, মহাবীরজী মাঝে-মাঝেই শার্টের খুঁট দিয়ে চোখ মুছছেন।

হঠাৎই কানে এল এক অদ্ভুত শব্দ। জোরে-জোরে কেউ যেন শ্বাস নিচ্ছে। অনেকটা সাপের ফোঁসফোঁস শব্দের মতো।

ভয় পেয়ে এপাশ-ওপাশ টর্চ ঘোরাতেই আওয়াজের কারণটা বোঝা গেল।

আলমারির পায়া ঘেঁষে লেপটে আছে একটা মোটাসোটা চন্দ্রবোড়া সাপ। তার মাথাটা সামান্য উঁচু হয়ে তাকিয়ে রয়েছে আমাদের দিকে। চোখ জ্বলজ্বল করছে। ফোঁসফোঁস শব্দে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে- সঙ্গে কালো নকশার আলপনা আঁকা শরীরটা একবার ফুলে উঠছে, একবার চুপসে যাচ্ছে।

মোহন লোহার রড মাথার ওপরে তুলে সাপটার দিকে দু-পা এগিয়ে গেল।

'মোহনজী, রুক যাইয়ে!' বলে চেঁচিয়ে উঠলেন রামপ্রসাদ তেওয়ারি।

মোহন যাদব থমকে দাঁড়াল।

'এ শিবজীর চেলা। শিবজী আমাদের সঙ্গে আছে। কোনও ভয় নেই।' বলে রামপ্রসাদ সাপটার কাছাকাছি এগিয়ে গেলেন। কমণ্ডলুর জল ছিটিয়ে দিলেন সরীসৃপটার গায়ে। আর আশ্চর্য! সাপটাও সড়সড় করে দেওয়ালের একটা বড় ফাটলে ঢুকে পড়ল।

আবার সব চুপচাপ। শুধু আমাদের শ্বাস নেওয়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে। তারই মধ্যে দূর থেকে ভেসে এল অনেকগুলো টিয়াপাখির ডাক—খোলা আকাশে টিয়ার ঝাঁক উড়ে যাচ্ছে।

টর্চের আলোয় অন্ধকার ঠেলে-ঠেলে সরিয়ে আমরা আর-একটা ঘরে ঢুকলাম। সেই ঘরেরও আধপোড়া ছন্নছাড়া দশা। আর তীব্র পোড়া গন্ধটা আমাদের নাকে লেগেই রইল।

পণ্ডিতজী যখন শান্তির জল ছেটাচ্ছেন তখন হঠাৎই আমি একটা হালকা শব্দ পেলাম। শ্বাস-প্রশ্বাসের ফোঁসফোঁস শব্দ। আবার।

শব্দটা যে বাকি তিনজনেও পেয়েছে সেটা বোঝা গেল ওদের টর্চের আলোর ঘোরাঘুরি দেখে। ওরা আবার কোনও সাপের খোঁজ করছে। আমিও আমার টর্চ ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সাপের খোঁজ করতে লাগলাম।

কিন্তু কোনও সাপই এবার আমরা খুঁজে পেলাম না। শুধু দুটো বড়-বড় মেঠো ইঁদুরকে ছুটে পালাতে দেখলাম।

একটু পরে বুঝলাম, শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দটা আমাদের খুব কাছে হচ্ছে। বলতে গেলে শব্দটা প্রায় আমাদের ঘিরে রেখেছে।

শুধু তাই নয়, শব্দটা মনে হচ্ছে অনেকের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ—একই ছন্দে, একই তালে শব্দটা ওঠা-নামা করছে। এবং সেই ছন্দ আর তাল মিলিয়ে ঠান্ডা বাতাসের ঝাপটা আমাদের গায়ে এসে লাগছে।

আমি ছাড়া বাকিদের গায়েও যে ওই কুবাতাস লাগছিল সেটা বোঝা গেল ওদের কথায়।

মোহন খানিকটা বিহ্বল গলায় বলল, 'মাস্টার সাব, একটা ঠান্ডা বাতাস গায়ে এসে লাগছে, টের পাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ, টের পাচ্ছি—।'

'এটা কীসের বাতাস? কোথা থেকে আসছে?' মহাবীর যাদব প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন।

কী উত্তর দেব এসব প্রশ্নের! আমার মনে হচ্ছিল, অনেক অশরীরী যেন আমাদের খুব কাছে এসে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। তারপর...।

রামপ্রসাদ তেওয়ারি বোধহয় ভয় তাড়ানোর জন্যেই 'জয় শিবশম্ভু!' বলে চেঁচিয়ে উঠলেন। তার প্রতিধ্বনি শোনা গেল কয়েকবার।

ঠিক তখনই লোহার সঙ্গে লোহার সংঘর্ষের শব্দ পেলাম: 'ঘটাং! ঘটাং!'

আমরা কয়েক সেকেন্ডের জন্যে হতভম্ব হয়ে গেলাম। কী করব বুঝে উঠতে পারলাম না।

মোহন যাদব ভয়ের গলায় বলে উঠল, 'মাস্টারসাব, কোই গড়বড়ি হো রহা হ্যায়। আমার তো কেমন লাগছে—।'

আমি ওকে ভরসা দিয়ে বললাম, 'ভয় পেয়ো না, মোহন—সব ঠিক আছে।'

পোড়া গন্ধটা এমনভাবে আমাদের নাকে আসতে লাগল যে, মনে হল, আমাদের চারপাশে যেন আগুন লেগেছে—শুধু তাপ-উত্তাপের ব্যাপারটাই আমরা যা টের পাচ্ছি না।

অন্ধকারে টর্চের আলো ফেলে-ফেলে একতলার আরও দুটো ঘরে মন্ত্র পড়ে শান্তির জল ছেটানো হল। তার মধ্যে একটা ঘর যথেষ্ট বড়, আর সেই ঘরে অনেকগুলো জং ধরা তোবড়ানো লোহার খাট দেখে মনে হল ঘরটা হসপিটালের কোনও ওয়ার্ড—মানে রুগিদের ঘর। সেই ঘরটায় কমণ্ডলুর জল ছেটানোর সময়

একটা ডানাভাঙা গোলা পায়রা চোখে পড়ল। গায়ে টর্চের আলো পড়তেই পায়রাটা শরীর টেনে-টেনে একটা খাটের তলায় অন্ধকারে ঢুকে গেল।

একটু এগোতেই দেখলাম, একটা দেওয়ালের কোণে অনেক পায়রার পালক ছড়িয়ে রয়েছে।

মহাবীরজী 'ইস-স' বলে উঠলেন। তারপর চাপা গলায় আমাকে জিগ্যেস করলেন, 'পমেশজী, দিনের বেলা এ-বাড়িটায় এত অন্ধকার কেন?'

আমি বললাম, 'দাগি বিল্ডিং—তার মরজি সে-ই জানে।' একটু ঠাট্টা করার চেষ্টা করলাম বটে, কিন্তু অন্ধকারের এই বিচিত্র ব্যাপারটা আমাকে ভাবিয়ে তুলেছিল।

'ঘটাং! ঘটাং!' শব্দটা আবার শুনতে পেলাম।

'কোথায় আওয়াজ হচ্ছে?' মোহন যাদব।

'লিফটে আওয়াজ হচ্ছে নাকি?' মহাবীর যাদব।

'চলুন—লিফটের কাছে গিয়ে দেখি...।' আমি।

'জয় শিবশম্ভু! চলিয়ে, লিফট কা পাস চলিয়ে। ইধর কা কাম হো গয়া—।' রামপ্রসাদ তেওয়ারি।

আমরা সবাই লিফটের দিকে এগোলাম। মহাবীর যাদব টর্চের আলোয় পথ দেখাতে লাগলেন। বললেন, 'আমার পেছন-পেছন আসুন...।'

হোঁচট খেয়ে, ঠোকর খেয়ে আমরা আন্দাজে লিফটের কাছাকাছি এসে দাঁড়ালাম। অবাক হয়ে দেখলাম, অন্ধকারের মধ্যে এক জায়গায় লাল আলো জ্বলছে। সেই আলো দিয়ে আঁকা রয়েছে একটা তিরচিহ্ন, আর একটা ইংরেজি সংখ্যা 'চার'। তার মানে লিফটের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি আমরা।

টর্চের আলো সামনে ফেলতেই লিফটটা বেশ স্পষ্ট হল।

লিফট তো নয়, এক প্রকাণ্ড লোহার খাঁচা। একটু আগের 'ঘটাং! ঘটাং!' শব্দ কি লিফটটা থেকেই হচ্ছিল? কিন্তু কী করে হবে? বিনা কারেন্টে লিফট নড়বে কেমন করে?

ঠিক তখনই মহাবীরজী অবাক হয়ে বললেন, 'বিনা বিজলিতে এই লাল বাত্তি জ্বলছে কেমন করে?'

আমি ওঁকে ভরসা দেওয়ার জন্যে বললাম, 'বোধহয় কোনওভাবে বিজলির কানেকশান থেকে গেছে—।'

আমরা চারজনে বেশ বিমূঢ় অবস্থায় লিফটের সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম। ওটার গায়ে টর্চের আলো বোলাতে লাগলাম। পোড়া গন্ধটা আমাদের নাকে আরও জোরালো হল। আমাদের ঘিরে থাকা শ্বাস-প্রশ্বাসের ছন্দ চলতে লাগল। ঠান্ডা বাতাসের ঝাপটা দিব্যি টের পাচ্ছিলাম। আমার গা শিরশির করছিল।

টর্চের আলোয় লিফটটাকে দেখে বেশ অবাক হয়ে গেলাম।

ইস্পাতের চাদর দিয়ে তৈরি প্রকাণ্ড মাপের একটা লোহার বাক্স। সেই চাদরে আবার নানান জোড়াতালি। কোথাও-কোথাও স্টিলের শিটের টুকরো নাট-বলটু দিয়ে অথবা ওয়েলডিং করে তাপ্পি মারা হয়েছে। ইস্পাতের চাদরের সারা গায়ে গুটি বসন্তের দাগের মতো ছোট-বড় চাকা-চাকা গর্ত—কোন এক অজানা কারণে টোল পড়ে গেছে। চাদরগুলো সব ঢেউ-খেলানো, উঁচু-নীচু। তার সারা গায়ে জং ধরা। সময় আর আগুন তার সব শক্তি, সব সৌন্দর্য শুষে নিয়েছে।

লিফটের দরজা বলতে একটা ভাঙাচোরা তোবড়ানো জং ধরা কোলাপসিবল গেট। তার পাটিগুলোর বেশিরভাগই ক্ষয়ে-ক্ষয়ে খসে পড়ে গেছে।

'বাজ পড়ে আগুন লেগে গিয়েছিল বলে লিফটটার এই বুরা হাল। তারপর ত্রিশ-বত্রিশ সাল পেরিয়ে গেল...।' মহাবীরজী বললেন, 'হসপিটালের সাতাশটা বাচ্চা এই লিফটের মধ্যেই খতম হয়ে গিয়েছিল। আমার বহিন...।' বলে ডুকরে উঠলেন মহাবীরজী। তারপর 'লছমি! লছমি!' বলে কাঁপা গলায় ডেকে উঠে কাঁদতে শুরু করলেন।

'রোনা-ধোনা বনধ।' ধমকে উঠলেন রামপ্রসাদ তেওয়ারি। তারপর: 'জয় হো শিবশম্ভু!' বলে হেঁকে উঠলেন। কমণ্ডলুর জল ছিটিয়ে দিলেন লিফটের গায়ে।

গরম কড়াইয়ে জল ছিটিয়ে দিলে যেমন 'ছ্যাঁক' করে শব্দ ওঠে ঠিক সেরকম শব্দ শোনা গেল।

আমি অবাক হয়ে লিফটের গায়ে টর্চের আলো ফেললাম। তিনটে টর্চের আলো লিফটের গায়ে ঘোরাঘুরি করছিল, তার সঙ্গে আমার চার নম্বর আলোটা যুক্ত হল। কিন্তু লিফটের গা থেকে বাষ্পের ধোঁয়া বেরোল কি না সেটা ঠিক ঠাহর হল না।

মোহন ভয় পেয়ে গেল। বলল, 'এসব কী হচ্ছে! ক্যায়সে হো রহা হ্যায়? কিঁউ হো রহা হ্যায়?'

আমি মোহনকে বকুনি দিলাম: 'মোহন, তুমি কেন ভয় পাচ্ছ? আমাদের হাতে তো লাঠি আছে!'

মোহন চুপ করে গেল—যদিও ওর ভয় কমল কি না বোঝা গেল না।

ঠিক তখনই ঠান্ডা বাতাসের শ্বাস-প্রশ্বাস আরও জোরালো হল। পোড়া গন্ধটা এত মারাত্মক বেড়ে গেল যে, মনে হল, আমরা শ্মশানে জ্বলন্ত চিতার সামনে দাঁড়িয়ে আছি। কিন্তু গায়ে কোনও আঁচ টের পাচ্ছি না।

রামপ্রসাদজী বললেন, 'চলুন, চলুন—ওপরে চলুন। বাকি ঘরগুলোয় কাজ শেষ করতে হবে—' তারপর মহাবীর যাদবকে বললেন, 'সিঁড়ি কোনদিকে?'

মহাবীর যাদব টর্চের আলো ফেলে সিঁড়ির দিকে এগোলেন। ওঁর পেছন-পেছন আমরা।

সিঁড়িগুলোর অবস্থা শোচনীয়। রেলিং কোথাও আছে, কোথাও নেই। যেখানে রেলিং আছে সেখানেও জায়গায় জায়গায় জং ধরে খসে পড়ে গেছে। আর সর্বত্র ধুলো, ধুলো আর ধুলো। সিঁড়ির ধাপের বহু জায়গায় সিমেন্ট ভেঙে পড়েছে। কোথাও-কোথাও বড়সড় ফাটল। সিঁড়িতে পুরু ধুলো তো আছেই, তার সঙ্গে পড়ে আছে শুকনো গাছের পাতা, আধখাওয়া ইঁদুরের দেহ, পাখির পালক। পোড়া গন্ধটার সঙ্গে এখন কেমন একটা বোঁটকা দুর্গন্ধ মিশে গেছে।

সিঁড়ি দিয়ে যখন আমরা উঠছি তখন হঠাৎই মেঘের ডাক শুনতে পেলাম। একইসঙ্গে শুনতে পেলাম লোহার 'ঘট-ঘটাং' শব্দ—বেশ কয়েকবার। মনে হল, কেউ যেন শব্দ করে নিজেকে জানান দিচ্ছে।

মোহন বলল, 'মাস্টারসাব, ইয়ে কেইসন আওয়াজ বা?'

'ওসব আওয়াজে কান দিয়ো না। সাবধানে ওপরে ওঠো—।'

মোহনকে সামাল দিলাম বটে, কিন্তু লোহায়-লোহায় সংঘর্ষের এই শব্দটা আমার মনে খচখচ করতে লাগল।

দোতলায় উঠে আমরা একইভাবে টর্চের আলো ফেলে ঘর থেকে ঘরে ঘুরে বেড়ালাম। রামপ্রসাদ তেওয়ারি নির্ভয়ে শান্তি-স্বস্ত্যয়নের কাজ করতে লাগলেন। সেই সময়ে আমরা পরপর কয়েকবার মেঘের গর্জন শুনতে পেলাম। একটু আগেও জানলার ফাঁকফোকর দিয়ে তাকিয়ে যে আলোর জ্যামিতিক টুকরোগুলো দেখতে পাচ্ছিলাম এখন সেসব উধাও। তা হলে বাইরের আকাশ কি মেঘে কালো হয়ে গেছে?

ঘরগুলোর কাজ সেরে আমরা কী মনে করে লিফটের দিকে এগোলাম। তা ছাড়া মহাবীর যাদব বারবার বলছিলেন, লিফটে ওঠার কোলাপসিবল দরজাগুলোও শোধন করা দরকার। তাই পায়ে-পায়ে আমরা পৌঁছে গেলাম লিফটের দরজার কাছে।

কিন্তু কী আশ্চর্য ব্যাপার!

লিফটটা এসে দোতলায় দাঁড়িয়ে রয়েছে! এবং দরজার পাশের প্যানেলে যে-লাল আলো জ্বলছে সেখানে ছবি সেই একই: তিরচিহ্ন এবং 'চার'।

মোহন আমার বাহু খামচে ধরল। আমি অন্ধকারে ওর হাতের ওপরে হাত রাখলামঃ 'ভয় পেয়ো না। আমাদের কাজ শেষ হয়ে আসছে। আর বড়জোর আধঘণ্টা কি চল্লিশ মিনিট। তা ছাড়া আমরা তো তোমার সঙ্গে আছি, মোহন।'

মোহন আমার হাতটা ছেড়ে দিল। আমার কথায় কতটুকু ভরসা পেল কে জানে!

আমি লিফটটার কথা ভাবছিলাম। ওটা চুপিচুপি দোতলায় উঠে এল কেমন করে! মান্ধাতার আমলের এইরকম বেঢপ চেহারার সার্ভিস লিফট ওঠা-নামা করলে অল্পবিস্তর শব্দ হওয়ার কথা। কিন্তু কোনওরকম

শব্দ তো আমরা শুনিনি! শুধু ওই 'ঘট-ঘটাং' শব্দগুলো ছাড়া। কোনও লিফট ওঠা-নামা করলে এরকম যে শব্দ হয় সেটা আমার জানা ছিল না।

দোতলার কাজ সেরে তিনতলা। তিনতলার পর চারতলা। এবং চারতলার পর পাঁচতলা। পাঁচতলা তো নয়, 'মরণতলা'।

এর মধ্যেই মেঘের গর্জন বাড়ছিল—বেশ ঘন-ঘন শোনা যাচ্ছিল। আর জানলার খোলা অংশ দিয়ে বাইরে তাকালে গাঢ় অন্ধকার। বিল্ডিং-এর ভেতরের চাপ-চাপ অন্ধকারের সঙ্গে সেই অন্ধকার যেন হাত মিলিয়ে নিয়েছে।

পাঁচতলায় এসেই মহাবীর যাদব ফুঁপিয়ে কান্না জুড়ে দিলেন। শত সান্ত্বনাতেও সে-কান্না আর থামতে চায় না। কান্নার মাঝে-মাঝেই তিনি 'লছমি! লছমি!' বলে ডেকে উঠছিলেন।

বাইরে যে বৃষ্টি নেমে গেছে সেটা বোঝা গেল বৃষ্টির শব্দে আর গন্ধে। আর এই পাঁচতলায় এসে পৌঁছানো মাত্র পোড়া গন্ধটা পাগলের মতো আমাদের জড়িয়ে ধরল।

প্রথমেই দুটো ছোট-ছোট ঘর। ঘর না বলে ঘরের ধ্বংসাবশেষ বলাই ভালো। প্রথম ঘরটায় দুটো টেবিল, চারটে চেয়ার, একটা আলমারি, আর একটা র‍্যাক। সবগুলোই পোড়া এবং ভাঙাচোরা। ধুলোময় নোংরা মেঝেতে কাত হয়ে পড়ে আছে। মাথার ওপরে একটা সিলিং ফ্যান—পুড়ে কালো হয়ে গেছে। তার ব্লেড তিনটে সাপের মতো এঁকেবেঁকে নীচের দিকে ঝুলছে।

ঘরটা দেখে মনে হয়, এককালে ডাক্তার-নার্সরা এই ঘরে বসত।

তার পাশের ঘরটা বোধহয় ওষুধপত্রের স্টোর রুম ছিল। কারণ, ঘরে দেওয়াল ঘেঁষে রাখা তিনটে র‍্যাক। র‍্যাকে অনেক শিশি-বোতল আর প্যাকেট। কিন্তু তার বেশিরভাগই ভাঙাচোরা, পুড়ে কালো হয়ে গেছে। ঘরের সিলিং ফ্যানটারও অষ্টাবক্র দশা।

ঘরটার মেঝেতে ছড়িয়ে আছে ধুলোমাখা কাচের টুকরো আর নানান জিনিসপত্র। এক অদ্ভুত ঝাঁঝালো গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে ঘরের বাতাসে।

দুটো ঘরেই মন্ত্রপূত শান্তির জল ছিটিয়ে দিলেন রামপ্রসাদজী। দ্বিতীয় ঘরটায় এসে আমাদের বললেন, 'আপনারা সবাই শিবজীর নাম নিন। ইয়ে ভুলিয়েগা মত কে ভূত-পিরেত যো ভি হ্যায় সব শিবশম্ভুকা গুলাম হ্যায়। জয়-জয় শিবশম্ভু!'

রামপ্রসাদজীর জিগির শেষ হওয়ামাত্রই আমাদের সবাইকে অবাক করে দিয়ে মাথার ওপরে সিলিং ফ্যানটা 'ক্যাঁচ ক্যাঁচ' শব্দে ঘুরতে শুরু করে দিল।

চমকে ওপরে তাকিয়ে দেখি, আঁকাবাঁকা পোড়া ব্লেডগুলো ঘোরার চেষ্টায় থরথর করে কাঁপছে।

রামপ্রসাদজী ফ্যানটা লক্ষ্য করে শান্তির জল ছুড়ে দিলেন। কিন্তু ভয় পাওয়া মোহন যাদব একটা গালাগাল দিয়ে জ্যান্ত হয়ে ওঠা ফ্যানটার গায়ে মরিয়া শক্তিতে লোহার রডের এক ঘা বসিয়ে দিল। আমরা কেউ মোহনকে বাধা দেওয়ার কোনও সময়ই পেলাম না।

যেটা আমাদের সবচেয়ে বেশি অবাক করল সেটা হল, রডের আঘাতের সঙ্গে-সঙ্গে যন্ত্রণার একটা চাপা আর্তনাদ শোনা গেল। ঠিক কোথা থেকে সে-আর্তনাদ ভেসে এল সেটা আমরা কেউই ঠাহর করতে পারলাম না।

রামপ্রসাদ তেওয়ারি আর মহাবীর যাদব প্রায় একইসঙ্গে মোহনকে ধমক দিলেন। মোহন মিনমিন করে বলল যে, ও খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল।

ভয় কি আমরাও পাইনি? আমার তো গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

এরপর যে শব্দটা শুনতে পেলাম সেটা আরও রহস্যময়: ঘর থেকে কয়েকজন যেন ছুটে বাইরে বেরিয়ে গেল।

আমরা টর্চের আলো এদিক-ওদিক ঘুরিয়েও কাউকে দেখতে পেলাম না। তখন নিজেদের মধ্যে এলোমেলো কথা বলতে লাগলাম। মোহন বলল, 'চলুন, তাড়াতাড়ি কাজ সেরে আমরা বাড়িটা থেকে বেরিয়ে যাই—।'

মহাবীরজী ওকে একটু ধমকের গলায় বললেন, 'একা-একা যখন এই ভূতিয়াঘরে ঢুকেছিলে তখন ভয় পাওনি!'

'আমি তো শুধু একতলায় ঢুকেছিলাম। আর এখন তো প্রত্যেকটা ঘরে ঢুকে-ঢুকে সবাইকে ডিসটার্ব করছি—।'

'সবাইকে মানে?'

'সব আতমাদের। তার মধ্যে...তার মধ্যে আপকা বহিন ভি হ্যায়...।'

মহাবীর যাদব কেঁদে ফেললেন এ-কথায়। বললেন, 'আমি আমার বহিনের আতমার মুক্তি চাই...শান্তি চাই...।'

আমি ওদের চুপ করতে বললাম। ওরা চুপ করে গেল। রামপ্রসাদজী সর্বক্ষণ বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ে চলেছেন। তারই মধ্যে লোহার সঙ্গে লোহার সংঘর্ষের শব্দ শোনা যাচ্ছিল বারবার: 'ঘট-ঘটাং, ঘট-ঘটাং...।'

আমরা এবার আর-একটা ঘরে ঢুকলাম। ঢুকেই বুঝলাম সেটা পেশেন্টদের ওয়ার্ড। কারণ, এই প্রথম ফিনাইলের গন্ধ আমাদের নাকে ঝাপটা মারল। পোড়া গন্ধের সঙ্গে মিশে গিয়ে সেই গন্ধটা এমন দাঁড়াল যে, সেটাকে ঠিকঠাকভাবে বোঝানো বেশ কঠিন।

টর্চের আলো ফেলে বুঝলাম ঘরটা মাপে অনেক বড়। দু'পাশে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে রয়েছে লোহার খাট। তার বেশ কয়েকটা ভাঙা, বেঁকেচুরে গেছে। খাটের ওপরে গদিগুলো সব আধখাওয়া, ছেঁড়াখোঁড়া।

টর্চের আলোয় কয়েকটা বড়সড় ইঁদুরকে ছুটে পালাতে দেখলাম।

মহাবীরজী এবার আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না—বাচ্চা ছেলের মতো কাঁদতে শুরু করলেন।

বৃষ্টি পড়ছে মুষলধারে। তার সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া, মেঘের 'গুড়-গুড়-গুড়-গুড়ুম' আর বিদ্যুতের চমক। হঠাৎ করে আবহাওয়া এতটা খারাপের দিকে গেল কেমন করে?

কয়েকটা জানলার পাল্লা হয় ছিল না, অথবা খুলে গিয়েছিল। প্রবল বাতাসে জলের মিহি গুঁড়ো অন্ধকার ঘরের ভেতরে পাক খেতে লাগল। তারই মধ্যে বরফের মতো ঠান্ডা বাতাস আমাদের শরীরে নিয়মিত ছন্দে পড়তে লাগল।

রামপ্রসাদজী চেঁচিয়ে বললেন, 'হমে কুছ গড়বড় লগতা হ্যায়। ইয়ে ফ্লোর কা কাম জলদি-জলদি খতম করনা জরুরি হ্যায়—।' বলেই আর দেরি করলেন না, শান্তির জল ছেটাতে-ছেটাতে প্রায় দৌড়োদৌড়ি শুরু করে দিলেন।

মোহন যাদব ভয় পেয়ে আমার হাত চেপে ধরল: 'মাস্টারসাব, ফিরে চলুন। পণ্ডিতজী ঠিক বলেছেন। এই ফ্লোরে কিছু তো গড়বড় আছে! দেখছেন না, অচানক বৃষ্টি কীরকম জমিয়ে এল। তার সঙ্গে কীরকম মেঘ ডাকছে, বাজ পড়ছে!'

ওর কথা শেষ হতে না হতেই 'কড়কড় কড়াৎ' শব্দে বাজ পড়ল। আমরা তিনজনেই কেঁপে উঠলাম। তীব্র সাদা আলোয় আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে গেল। রামপ্রসাদজী তখন আমাদের তিনজনের কাছ থেকে অনেকটা দূরে—দিশেহারাভাবে কমণ্ডলু আর টর্চ নিয়ে ঘরের এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করছেন।

মহাবীর যাদব হঠাৎই একটা দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া লোহার খাটের কাছে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন। ওঁর হাত থেকে লাঠি আর টর্চ খসে পড়ল। তারপর খাটে মাথা ঠুকতে লাগলেন আর ভাঙা গলায় কাঁদতে লাগলেন।

'লছমি! লছমি! এই বেডেই লছমি ছিল। ইসি বেডমেই উও থি, পমেশজী, ইসি বেডমে...।'

আমি কী করব বুঝে উঠতে পারছিলাম না।

হঠাৎই আমাদের টর্চের আলোয় একটা অদ্ভুত ব্যাপার ধরা পড়ল।

কালো কুয়াশার পিণ্ডের মতো কতকগুলো গাঢ় ছায়া ঘরের মধ্যে নড়ে বেড়াচ্ছে। কখনও ওরা এদিকে-ওদিকে ছুটে যাচ্ছে, কখনও লাফিয়ে উঠে পড়ছে লোহার খাটগুলোর ওপরে। কখনও বা একটা ছায়ার পিণ্ড আর-একটা পিণ্ডের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে।

দুটো ছায়ার পিণ্ড আমার আর মোহনের কাছে এগিয়ে এসেছিল। মোহন ভয় পেয়ে ওগুলোর ওপরে লোহার রড চালিয়ে দিল। রড নেহাতই বাতাস কেটে একটা খাটে গিয়ে লাগল। আর মোহন ভয়ে চিৎকার করে উঠল।

পরিস্থিতি আমারও ভালো ঠেকছিল না। তাড়াতাড়ি এখান থেকে চলে যেতে পারলে হয়। বাইরের দুর্যোগের সঙ্গে হয়তো মোকাবিলা করা যায়, কিন্তু ভেতরের এই দুর্যোগের সঙ্গে মোকাবিলা করব কেমন করে?

কী মনে হওয়ায় রামপ্রসাদ তেওয়ারির দিকে টর্চের আলো ফেললাম। এবং যা দেখলাম তাতে আমার বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল। বরফজলের স্রোত নেমে গেল শিরদাঁড়া বেয়ে।

পাশবালিশের মতো কতকগুলো জমাট কুয়াশার পিণ্ড রামপ্রসাদজীর শরীরের সঙ্গে যেন লেপটে আছে। ওগুলো বোধহয় রামপ্রসাজীকে এলোমেলোভাবে ঠেলা মারছিল, কারণ, পণ্ডিতজীর শরীরটা টলে যাচ্ছিল বারবার। কিন্তু ওঁর সাহস সত্যিই প্রশংসা করার মতো। কারণ, ওই কুয়াশা-পিণ্ডগুলোর ধাক্কা সামলে পণ্ডিতজী ওগুলোর ওপরে কমণ্ডলুর জল ছিটিয়ে চলেছেন, শিবশম্ভুর নাম নিয়ে চলেছেন অবিরাম।

আবার ভয়ংকর শব্দে বাজ পড়ল।

সাদা আলো আর শব্দের পাশাপাশি আরও একটা বিপর্যয় ঘটে গেল। পাঁচতলার একটা অংশ ভেঙে পড়ল।

টর্চের আলোয় একটু আগেই যেখানে দেওয়াল দেখতে পাচ্ছিলাম সেখানে এখন শূন্যতা আর ঝোড়ো বৃষ্টি। বৃষ্টির ঝাপট সাইক্লোনের মতো পাক খেয়ে ঘুরতে লাগল ঘরের মধ্যে। ঠিক সেই সময়ে 'ঘটাং! ঘটাং!' শব্দ কানে এল। সব মিলিয়ে অদ্ভুত এক সংকটের কাল।

হঠাৎই আমার মনে হল, আর এক মুহূর্ত যদি এখানে অপেক্ষা করি তা হলে আমাদের সর্বনাশ হবে।

মোহন যাদব আমার হাত জাপটে ধরল। ও ধুম জ্বরের রুগির মতো থরথর করে কাঁপছে।

আমি চিৎকার করে মহাবীর যাদবকে ডাকলাম, 'মহাবীরজী, জলদি আসুন—এবার পালাতে হবে—!'

মোহন 'রামপরসাদজী! পণ্ডিতজী!' বলে ডাকতে লাগল আতঙ্কে।

মহাবীর যাদবও নিশ্চয়ই ভয় পেয়েছিলেন, কারণ, আমার ডাকের রেশ মিলিয়ে যাওয়ার আগেই তিনি ছুট লাগালেন সিঁড়ির দিকে।

আমি আর মোহনও দেরি করলাম না—ছুট লাগালাম ওঁর পেছন-পেছন। সেই অবস্থাতেই টের পেলাম, রামপ্রসাদ তেওয়ারিও আমাদের পেছনে ছুটে আসছেন।

পোড়া গন্ধটা এখনও নাকে টের পাচ্ছিলাম, কিন্তু ঠান্ডা শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যাপারটা ঝড় আর বৃষ্টি চাপা দিয়ে দিয়েছে।

ছুটে আমরা চারজনে যখন সিঁড়ির কাছে এসে পৌঁছলাম তখন আসল সর্বনাশটা দেখতে পেলাম। বাজ পড়ার দাপটে জরাজীর্ণ সিঁড়িটার পাঁচতলার প্রায় পুরো অংশটাই ধসে পড়েছে নীচে।

আমরা থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। মহাবীর যাদবের টর্চ আর লাঠি কোথায় ছিটকে পড়ে গেছে কে জানে! তখনও মানুষটা কাঁদছে আর ওর বোনের নাম বিড়বিড় করছে।

ভয়ংকর শব্দে বাজ পড়ল আবার।

তখনই আমার চোখ গেল বেঢপ লিফটটার দিকে।

ওটার দরজা খোলা। দরজার পাশে লাল আলোয় লেখা তিরচিহ্ন জ্বলছে। জ্বলছে ‘চার’ লেখাটাও। কিন্তু লিফটটা পাঁচতলায় কখন এল? কেমন করে এল?

লিফটের খোলা দরজাটা দেখে আমার মনে হল, ওটাই পালানোর একমাত্র পথ।

‘ঘট-ঘটাং। ঘট-ঘটাং!’ শব্দ ভেসে এল ইস্পাতের বাক্সটার দিক থেকে। ওটা যেন আমাদের ডাকছে।

নিশির ডাকের মতো একটা মায়া আমাকে জড়িয়ে ধরল। আমি ছুটলাম লিফটের দিকে। আমার পেছন-পেছন বাকি তিনজন।

আমরা চারজন ঢুকে পড়তেই নিজে থেকে বন্ধ হয়ে গেল লিফটের ভাঙা দরজা। এবং লিফটটা নিজে থেকেই চলতে শুরু করল।

মোহন যাদব কাঁপা গলায় বলল, ‘ইয়ে সব কেয়া হো রহা হ্যায়? এই শয়তান লিফটটাকে কে চালাচ্ছে?’

আমি কোনও জবাব দিলাম না। টর্চের আলোয় লিফটটাকে ভালো করে দেখতে লাগলাম। এককথায় বলতে গেলে জং ধরা জরাজীর্ণ একটা লোহার বাক্স। চলার সময় ওটা থরথর করে কাঁপছে। ‘ঘট-ঘট-ঘটাং’ শব্দ হচ্ছে। মনে হচ্ছে, এই বুঝি ইস্পাতের চাদরের জোড়াতালিগুলো খসে পড়বে—কিন্তু খসে পড়ছে না।

লিফটটা কোন তলায় যাচ্ছে জানি না, তবে যাচ্ছে যে নীচের দিকেই সেটা টের পাচ্ছি।

নানান ফ্লোরে যাওয়ার জন্যে লিফটের ভেতরে একটা বড়সড় পেতলের হাতল রয়েছে, কিন্তু ইন্ডিকেটর ল্যাম্পের কোনও প্যানেল নেই।

লিফটটা মাপে প্রকাণ্ড। অন্তত পঁচিশ-তিরিশজন তার ভেতরে অনায়াসে এঁটে যাবে। আমরা চারজন জড়সড়ো হয়ে লিফটের মাঝখানটায় দাঁড়িয়েছিলাম। এখন শুধু একটাই চিন্তা: কোনওরকমে এই বিল্ডিং-এর বাইরে বেরোতে পারলে হয়!

হঠাৎই আমরা চারজন কেমন যেন পিছিয়ে যেতে লাগলাম।

‘কী হচ্ছে? কী হচ্ছে?’ বলতে-বলতে টের পেলাম সামনে থেকে চাপ আসছে—যেন আরও অনেক লোকজন গাদাগাদি করে উঠে পড়েছে লিফটে। আমি এপাশ-ওপাশ টর্চের আলো ফেললাম। এবং ভয়ে চমকে উঠলাম।

তাল-তাল কুয়াশার পিণ্ড লিফটের মধ্যে হাজির হয়েছে। ওদের চাপে আমরা কোণঠাসা হয়ে গেছি।

ওরা কারা? ওদের স্পর্শই বা কেন এত ঠান্ডা লাগছে শরীরে?

স্বীকার করতে লজ্জা নেই, আমি ভালোরকম ভয় পেয়েছিলাম। কিন্তু মোহন যাদবের মতো একজন শক্তসমর্থ যুবক আমার চেয়ে ভয় পেয়েছে অনেক বেশি। ও ভয়ে চোখ বুজে আমার ঘাড়ের কাছে মুখ গুঁজে রয়েছে। ওর মুখ দিয়ে গোঁ-গোঁ শব্দ বেরোচ্ছে।

মহাবীরজীর দিকে টর্চের আলো ফেলে দেখি তিনি যেন দাঁড়িয়ে থাকা এক কাঠের পুতুল।

রামপ্রসাদ তেওয়ারি তেমন একটা ভয় পেয়েছেন বলে মনে হল না। ওঁর ঠোঁটে সেই একই মন্ত্র—যে-মন্ত্রের ওপরে ওঁর ভরসা আছে, বিশ্বাসও আছে।

এমন একটা সময়ে ‘কড়কড় কড়াৎ’ শব্দে ভয়ংকর এক বাজ পড়ল খুব কাছে। বাজের সাদা আলোর ঝলকানিতে কিছুক্ষণের জন্যে অন্ধ হয়ে গেলাম। বাজের দুশো ডেসিবেল লেভেলের আওয়াজ আমাদের কানে তালা লাগিয়ে দিল।

কোথায় যেন আগুন ধরে গেল। খুব তীব্র পোড়া গন্ধ আসছে নাকে। কিছু পুড়ে যাওয়ার ‘চড়চড়’ শব্দ হচ্ছে কোথাও।

হঠাৎই টের পেলাম লিফটের দেওয়ালটা উনুনে বসানো হট প্লেটের মতো গরম হয়ে উঠেছে। পিঠে যেন ছ্যাঁকা লাগছে।

লিফটটা একতলায় নেমে গিয়েছিল। কিন্তু সেখানে না থেমে বিরাট ঝাঁকুনি দিয়ে আবার দুরন্ত গতিতে উঠতে শুরু করে দিল ওপরে। আমরা ভয়ে চিৎকার করতে শুরু করলাম।

সে একটা সাংঘাতিক অবস্থা!

লিফটটা অসহ্য ঝাঁকুনি দিয়ে ওপরে উঠছে। কানফাটানো শব্দ হচ্ছে 'ঘট-ঘট-ঘটাং'। সঙ্গে আমাদের ভয়ের চিৎকার।

তার সঙ্গে হঠাৎই জড়িয়ে গেল চাপা কান্নার শব্দ। মিহি গলার আওয়াজে অনেকে মিলে কাঁদছে। আর্ত কলরোল ভেসে বেড়াচ্ছে লিফটের বদ্ধ বাতাসে।

আমরা চিৎকার থামিয়ে মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলাম। কারা কাঁদছে? কোথায় কাঁদছে?

মহাবীর যাদব আচমকা 'লছমি! লছমি!' বলে হাহাকার করে উঠলেন।

কান্নার রোল ক্রমে জোরালো হতে লাগল। আমাদের ঘিরে সেই আর্ত শব্দতরঙ্গ লিফটের ভেতরে ঘুরপাক খেতে লাগল।

প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে আদিম লোহার খাঁচাটা হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। এবং পরক্ষণেই মাতালের মতো টলতে-টলতে প্রবল গতিতে নীচের দিকে ছুটে চলল।

আমি চিৎকার করে বললাম, 'লিফটটা একতলায় গেলেই আমাদের দরজা খুলে বাইরে লাফ মারতে হবে। যেমন করে হোক। তা না হলে আমাদের অবস্থা হবে ওই সাতাশটা বাচ্চার মতো...!'

'সহি কহা হ্যায় মাস্টারজীনে। আপ সব রেডি হো যাইয়ে—।' রামপ্রসাদ তিওয়ারি বললেন।

রেলগাড়ি শান্টিং-এর সময় যেরকম শব্দ হয় ঠিক সেরকম শব্দ তুলে লিফটটা একতলায় এসে বলতে গেলে আছড়ে পড়ল।

আমরা চারজন একসঙ্গে কোলাপসিবল গেট ধরে টান মারলাম। গেট খুলল না। আবার টান মারলাম।

লিফটের আঁচে শরীর ঝলসে যাচ্ছে। দরদর করে ঘামছি। আর কিছুক্ষণ এই অভিশপ্ত খাঁচায় বন্দি থাকলে আমরা সবাই পুড়ে শেষ হয়ে যাব। প্রাণপণ শক্তিতে ভাঙা কোলাপসিবল গেটটা ধরে আরও একবার টান মারলাম।

তৃতীয়বারের চেষ্টায় গেটটা খুলে গেল।

আমরা দরজা ডিঙিয়ে বাইরে লাফিয়ে পড়ামাত্রই প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ল।

আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেল। কানে তালা লেগে গেল। পেছনে তাকিয়ে দেখি লিফটটায় আগুন ধরে গেছে। ওটার দেওয়ালে তালি মারা ইস্পাতের পাতগুলো খসে-খসে পড়ছে।

আমরা টর্চের আলোয় সদর দরজাটা দেখতে পেলাম। তা ছাড়া আগুনের আভাও আমাদের বাড়তি সাহায্য করল। একটুও দেরি না করে আমরা সদর দরজা লক্ষ্য করে ছুট লাগালাম।

কিন্তু হঠাৎই দেখি দু-তিনটে লোহার পাত আমাদের পেছন-পেছন শূন্যে বাতাস কেটে ধেয়ে আসছে। শিকারি বাজ যেভাবে তিরবেগে ধেয়ে আসে।

প্রাণ বাঁচাতে আরও জোরে ছুটতে শুরু করলাম। কিন্তু একটা উড়ন্ত 'বাজপাখি' মোহন যাদবকে ধরে ফেলল। সরাসরি ওর ঘাড়ে এসে আঘাত করল। একেবারে তরোয়ালের কোপের মতো।

মোহনের দেহটা মুখ থুবড়ে পড়ল মাটিতে।

একপলকের জন্যে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

মোহনের মাথাটা কোনওরকমে দেহের সঙ্গে আটকে আছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে ফাটল ধরা ধূলিমলিন মেঝে। ওর চোখ দুটো মরা মাছের মতো চেয়ে আছে সিলিং-এর দিকে।

কী মর্মান্তিক মৃত্যু!

প্রথমবারে মোহন যাদব বেঁচে গিয়েছিল। গাল আর গলায় কোপ লাগলেও সেরে উঠেছিল। সেদিন ও গাঢ় অন্ধকারে বুঝতে পারেনি কে বা কী ওকে আক্রমণ করেছে।

ছোকরু আর মুন্নার রহস্যময় মৃত্যুর কারণও এবার বুঝতে পেরেছি আমি।

লিফট! ওই অভিশপ্ত লিফট!

রামপ্রসাদজী আর মহাবীর যাদব দরজা পেরিয়ে বাইরে চলে গেছেন। কয়েক মুহূর্ত দেরি করায় আমি একটু পিছিয়ে রয়েছি। কিন্তু ছুটে চলেছি আবার। সেই অবস্থাতেই পেছনে তাকিয়ে দেখি, ছোট মাপের দুটো উড়ন্ত পাত ছুটে আসছে আমাকে লক্ষ্য করে। তাপে পাতদুটো লালচে হয়ে গেছে।

ছোটার গতি আরও বাড়িয়ে দিলাম। পলকের মধ্যে বাইরের মাঠে চলে এলাম। কিন্তু আঘাত এড়াতে পারলাম না। একটা পাত চাপড়ের মতো এসে লাগল আমার পিঠে। আর দ্বিতীয়টা নিনজা স্টারের মতো আমার বাঁ-হাতের বাহুকে ক্ষতবিক্ষত করে দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে গেল।

পড়ে যেতে-যেতে কোনওরকমে নিজেকে সামলে নিলাম। রক্তপাত, যন্ত্রণা সব ভুলে গিয়ে ছুটে চললাম। দেখলাম, আরও কিছুটা দূরে দুটো কালো ছায়া দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। তাদের একজনের হাতে ত্রিশূল আর কমণ্ডলু।

আকাশ অন্ধকার। ঘোর কালো মেঘ জমাট বেঁধে আছে আকাশ জুড়ে। বৃষ্টি পড়ছে, তবে তেমন জোরে নয়। বৃষ্টিতে মাঠটা কাদা-কাদা হয়ে গেছে।

টের পেলাম, অভিশপ্ত বাড়িটা থেকে বেরিয়ে আসার পর আমার দমবন্ধ ভাবটা কেটে গেছে।

টলতে-টলতে হাঁপাতে-হাঁপাতে আরও কিছুটা ছুটে চলার পর পণ্ডিতজী আর মহাবীর যাদবের কাছে পৌঁছলাম। দেখলাম, ওঁরা দুজনেও হাঁপাচ্ছেন।

আমরা কেউ কোনও কথা বলছিলাম না। বৃষ্টিতে ভিজছিলাম আর তাকিয়ে ছিলাম ছায়া রঙের ভাঙাচোরা বাড়িটার দিকে। ওটার দরজা দিয়ে আগুনের আভা চোখে পড়ছিল।

আমি বাঁ-হাতের কাটা জায়গাটায় হাত চেপে ধরে রক্ত বন্ধ করার চেষ্টা করছিলাম। জায়গাটা ভীষণ জ্বালা করছিল। আর পিঠটা যেন পুড়ে যাচ্ছিল।

হঠাৎই একটা অদ্ভুত ব্যাপার আমার চোখে পড়ল।

'ঘট-ঘট-ঘটাং' করে প্রচণ্ড এক শব্দ ভেসে এল বাড়িটা থেকে। তারপরই আগুনের আভাটা আগুনের শিখা হয়ে গেল। জ্বলন্ত লিফটটা কীভাবে যেন চলে এসেছে সদর দরজার কাছে। তারপর...।

তারপর যা হল, সেটা এত বছর পরেও বিশ্বাস হতে চায় না।

পুরোনো বাড়ির দরজা ভেঙে জ্বলন্ত লিফটটা টলতে-টলতে বেরিয়ে এল দরজার বাইরে। লিফটের প্রবল ধাক্কায় ফ্রেমসমেত দরজাটা তো ভেঙে পড়লই, তার লাগোয়া দেওয়াল থেকে একগাদা ইট খসে গিয়ে এক প্রকাণ্ড হাঁ তৈরি হয়ে গেল।

তারপর সেই ভয়ংকর লিফটটা আমাদের লক্ষ্য করে ছুটে আসতে লাগল।

জলকাদা ভরা মাঠের ওপর দিয়ে টলতে-টলতে টাল খেতে-খেতে দানবের মতো প্রকাণ্ড জ্বলন্ত লিফটটা ছুটে আসছে। ওটার অভিঘাতে বৃষ্টির জল ছিটকে যাচ্ছে চারপাশে। বৃষ্টির ফোঁটা ওটার লাল গনগনে শরীরে পড়ামাত্রই হয়তো 'ছ্যাঁক-ছোঁক' শব্দ হচ্ছিল, কিন্তু ইস্পাতের সঙ্গে ইস্পাতের সংঘর্ষের শব্দে সেই শব্দ কানে আসছিল না।

আমরা ভয়ে ছুটতে শুরু করলাম আবার। তবে 'আমরা' মানে দুজন : আমি আর মহাবীর যাদব।

পেছনে তাকিয়ে দেখি, রামপ্রসাদজী রুখে দাঁড়ানো যোদ্ধার মতো দু-পা ফাঁক করে ডানহাতে ত্রিশূল উঁচিয়ে মারমুখী ভঙ্গিতে ছুটে আসা লিফটটার জন্যে যেন অপেক্ষা করছেন। ছিপছিপে লম্বা মানুষটার শরীরের সমস্ত ভয়-ডর যেন উবে গেছে।

'জয়-জয় শিবশম্ভু!' গর্জে উঠলেন রামপ্রসাদ। অন্ধকার আকাশ-বাতাস যেন কেঁপে উঠল। তারপর মানুষটা গরগর রাগে গলা ফাটিয়ে বললেন, 'আ যা, শয়তান! তু শিবজী কো নহি মানতা? শিবজী তুঝে আভি নাশ করেঙ্গে। শিবজী কা পাওয়ার তুঝে নহি মালুম! আ যা...।'

লিফটটা রামপ্রসাদজীর খুব কাছে এসে গিয়েছিল। আমি আশঙ্কা আর কৌতূহলে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। এই পাগল পণ্ডিতজীকে এখন আমি কী করে বাঁচাই!

'পণ্ডিতজী!' চিৎকার করে ওঁকে ডাকলাম। কিন্তু তিনি ফিরেও তাকালেন না।

মহাবীর যাদব তখন 'দাওয়াই টাউন'-এর সীমানার বাইরে চলে গেছেন। সেখান থেকে বারবার 'পমেশজী! পমেশজী!' করে আমাকে ডাকছেন।

অভিশপ্ত লিফটটা যখন পণ্ডিতজির বেশ কাছে এসে গেছে তখন তিনি 'জয় শিবশম্ভু!' বলে জ্বলন্ত লোহার বাক্সটাকে লক্ষ্য করে হাতের ত্রিশূল ছুড়ে দিলেন।

পলকে এক বিস্ফোরণ ঘটে গেল। প্রচণ্ড শব্দে বোমার মতো ফেটে গেল লিফটটা। হাজার টুকরোয় চুরচুর হয়ে অসংখ্য আগুনের ফুলকি ছড়িয়ে গেল বৃষ্টি-ভেজা বাতাসে। আর তার সঙ্গে শোনা গেল একরাশ বাচ্চার যন্ত্রণা ও বেদনা মেশানো কান্না। নিচু পরদায় শুরু হয়ে ক্রমশ উঠে গেল উঁচু গ্রামে। তারপর কেঁপে-কেঁপে ধীরে-ধীরে মিলিয়ে গেল।

আমার বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠল।

আমি আবার চিৎকার করে ডাকলাম, 'পণ্ডিতজী! পণ্ডিতজী!'

রামপ্রসাদ তিওয়ারি থরথর করে কাঁপছিলেন। আমার ডাকে ফিরে তাকাতে গিয়ে তিনি বোধহয় মাথা ঘুরে খসে পড়ে গেলেন ভেজা মাটিতে।

আমি ছুটে গিয়ে ওঁকে তুলে দাঁড় করালাম। টের পেলাম, ওঁর শরীরটা তখনও কাঁপছে। আমার বুকের ভেতরে টিপটিপ শব্দ হচ্ছে।

মহাবীরজী ছুটে চলে এলেন আমাদের কাছে। আমার একটা হাত জাপটে ধরলেন।

আমরা তিনজন পরস্পরকে ছুঁয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। তাকিয়ে রইলাম হসপিটাল বিল্ডিংটার দিকে।

আজ যতই ঝড়-বৃষ্টি হোক, কালকের নতুন সকালটা যেন অমলিন সুন্দর হয়।

সমাপ্ত